Contents

# তাওহীদের ডাক

জুলাই-আগস্ট ২০১৫

- ত্বাগূতের পরিচয় ও পরিণাম
- শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ
- সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের শাখা
- নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকার
- লেক-পাহাড়ের রাঙ্গামাটি
- কুরআনের ভুল খুঁজতে গিয়ে ইসলামের ছায়াতলে ডক্টর গ্যারি মিলার

Maynaguri

Patgram

Mathabanga

Bhurungamari

N

ASSAM

## ছিটমহল

উন্মুক্ত কারাগার, অতঃপর মুক্তির নিশ্বাস

## হিরোসিমা-নাগাসাকিতে রক্তাক্ত ট্রাজেডী

সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি :

Contents

# তাওহীদের ডাক

২৪তম সংখ্যা

জুলাই-আগস্ট ২০১৫





**যোগাযোগ**
**তাওহীদের ডাক**
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সহকারী সম্পাদক : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯ (বিকাশ)
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।


## সূচীপত্র

Contents

# সম্পাদকীয়

## যুলুম ও অহঙ্কার : পরিণাম ধ্বংস

যে দু'টি জিনিষ মানুষকে দ্রুত স্বেচ্ছাচারী, বেপরোয়া ও আমিত্বপরায়ণ করে তুলে, সে দু'টি হল, যুলুম ও অহঙ্কার। এর বিনাশও হয় খুব তাড়াতাড়ি। বিলম্বে হলেও তা হয় অত্যন্ত ন্যক্কারজনক, অবর্ণনীয় ও কল্পনাতীত। এ জন্য যুলুম ও অহঙ্কারের মত ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে সবারই বেঁচে থাকা অপরিহার্য। কারণ এর পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

কোন বস্তুকে তার স্থানে না রেখে অন্য স্থানে রাখাই 'যুলুম'। যুলুম হল অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, নিষ্পেষণ ইত্যাদি। মানুষের যখন ক্ষমতার দাপট ও সম্পদের আধিক্য থাকে, তখন অন্যের উপর অত্যাচার করে, কোন মানুষকে মানুষ মনে করে না। অন্যদের জন্তু-জানোয়ার মনে করে। খুন, হত্যা, আত্মসাৎ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস সব তার কাছে বৈধ মনে হয়। ক্ষমতা দখল, জমি দখল, বাড়ী দখল, চুরি, ডাকাতি সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হয়। আর নিজের ভবিষ্যতের কথা ভুলে যায়। তার জন্য যে এক সময় অন্ধকার নেমে আসবে, পাশে কাউকে পাবে না, নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, হাযার চেষ্টা করেও কোন লাভ হবে না এ কথাগুলো ভুলে যায়। আল্লাহ তা'আলা নূহ, হূদ, ছালেহ, লূত্ব, শু'আইব (আঃ)-এর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে ধ্বংসে নিমজ্জিত করেছেন। বিশ্ব যালেম ফেরাঊন ও তার দাম্ভিক কওমকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাদের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, 'আপনার প্রতিপালক যখন কোন অত্যাচারী জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই কঠোর' *(হূদ ১০২)*। যালেমদের যারা সহযোগিতা করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র হুঁশিয়ারী হল, 'যারা অত্যাচারী তাদের দিকে তোমরা ঝুঁকে পড় না। কারণ তাদের সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে' *(হূদ ১১৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যালেমকে আল্লাহ (কিছু সময়) অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না' *(বুখারী হা/৪৬৮৬; মিশকাত হা/৫১২৪)*। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় সাবধান করে দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি মাযলূম ব্যক্তির বদদো'আ থেকে বেঁচে থাক। কারণ মাযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা নেই। অর্থাৎ তার দো'আ আল্লাহ দ্রুত কবুল করেন *(বুখারী হা/১৪৯৬; মিশকাত হা/১৭৭২)*। আল্লাহ যে দুনিয়াতেই যালেমকে অতি দ্রুত শায়েস্তা করেন, এগুলো তার বাস্তব প্রমাণ। যালেমের ঔদ্ধত্য মস্তক গুঁড়িয়ে দেন, তার বিষদাঁত ভেঙ্গে দেন এবং মাযলূমকে রক্ষা করেন।

পরকালেও যালেমের রেহাই নেই। নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৩)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি তার অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার করেছে- তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়- ঐ দিন (ক্বিয়ামত) আসার পূর্বেই, যেদিন তার নিকট কোন দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। যদি তার সৎ আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী নেয়া হবে। আর যদি নেকী না থাকে, তবে মাযলূমের পাপ তার উপর চাপানো হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*। তিনি বলেন, 'তোমরা বলতে পার সবচেয়ে দরিদ্র কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যার কোন অর্থ নেই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের সবচেয়ে গরীব এমন ব্যক্তি, যে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। অপরদিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সম্পদ ভক্ষণ করা, অপবাদ দেয়া ও গালি দেয়ার অভিযোগ নিয়েও অন্যরা উপস্থিত হবে। তখন তার নেকী হতে তাদেরকে পরিশোধ করা হবে। তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তাদের পাপ নিয়ে তার উপর চাপানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮)*।

'অহঙ্কার পতনের মূল' কথাটি সমাজে প্রচলিত থাকলেও এর কার্যকারিতা নেই। ক্ষমতা, অর্থ, ইলম, পদমর্যাদা ও সম্মানের আধিক্য মানুষকে অহঙ্কারী বানায়। যিনি এগুলো দান করেছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়। আমিত্বের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, দম্ভভরে বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করে। ডাহা মিথ্যাকে সত্য, জাজ্বল্য সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কথা-কর্মে, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, নাওয়া-খাওয়া, আচার-ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে অহংকার বিস্তৃতি লাভ করে। অথচ এই সর্বনাশা অহংকার মানুষের জন্য হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অহংকার আমার চাদর আর বড়ত্ব আমার লুঙ্গী। এই দু'টির কোন একটি কেউ গ্রহণ করলে, আমি তাকে জাহান্নামে দেব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১১০)*। আল্লাহ বলেন, 'তুমি পৃথিবীতে অহঙ্কার করে চল না। নিশ্চয় তুমি যমীনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না' *(ইসরা ৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার অন্তরে যাররা পরিমাণ অহঙ্কার রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি বলল, কেউ চায় তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক। রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন। কিন্তু অহংকার হল, সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা *(মুসলিম হা/২৭৫; মিশকাত হা/৫১০৮)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, অহঙ্কারীরা মানুষের চেহারা নিয়ে ক্বিয়ামতের মাঠে পিঁপড়া সদৃশ উঠবে। প্রত্যেক স্থানে অপমান তাদেরকে ঘিরে ধরবে। অতঃপর 'বূলাস' নামক জাহান্নামের এক জেলখানার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে অগ্নিশিখা তাদেরকে গ্রাস করবে। তথায় তাদেরকে জাহান্নামীদের দগ্ধিত শরীরের গলিত রক্ত-পুঁজ ভর্তি 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক সাগর থেকে পান করানো হবে *(তিরমিযী হা/২৪৮২; মিশকাত হা/৫১১২, সনদ হাসান)*।

যালেমের যুলমী কষাঘাতে দেশ ও জাতি আজ অধঃপতিত। আবালবৃদ্ধবনিতা কারো জীবনই আজ নিরাপদ নয়। দাম্ভিকের হিংস্র নখরে মানবতা নিষ্পেষিত। পারস্পরিক হানাহানি, খুনাখুনিতে নিপতিত। এর পতন কি হবে না? অবশ্যই হবে। দুনিয়ার কোন যালেম ও অহংকারী যুলুম করে, অত্যাচার করে রক্ষা পায়নি। নমরূদ, আযর, ফেরাঊন, হামান, কারূণ ও আবু জাহলরাই তার বড় প্রমাণ। তারা পৃথিবীতে সাময়িক রাজত্ব করে চিরস্থায়ী গ্লানি ও লাঞ্ছনা নিয়ে অপমানিত হয়ে ধরা থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু আধুনিক যালেম-অহংকারীরা সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। আল্লাহ আমাদেরকে যালেমের যুলুম ও অহংকারীর দম্ভ থেকে রক্ষা করুন! মুসলিম জাতিকে হেফাযত করুন-আমীন!!

# প্রবৃত্তির অনুসরণ

**আল-কুরআনুল কারীম :**

١- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.

**(১)** ‘নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তাঁর পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারিয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (জিবরীল) দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু এনেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ আর কতেককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ?’ *(বাক্বারাহ ২/৮৭)*।

٢- قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

**(২)** ‘বলুন, তোমরা সত্যবাদী হ’লে আল্লাহ্র নিকট থেকে এক কিতাব আনয়ন কর, যা পথনির্দেশে এতদুভয় হ’তে উৎকৃষ্টতর হবে; আমি সে কিতাব অনুসরণ করব’। অতঃপর তারা যদি আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহ’লে জানবেন যে, তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র পথ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৪৯-৫০)*।

٣- بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

**(৩)** ‘বরং সীমালঙ্ঘনকারীরা অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই’ *(রূম ৩০/২৯)*।

٤- أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

**(৪)** ‘আপনি কি লক্ষ্য করেছেন তাকে, যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন ও চক্ষুর উপর আবরণ রেখেছেন। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে ন?’ *(জাছিয়া ৪৫/২৩)*।

٥- إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى.

**(৫)** ‘এগুলো কতক নাম মাত্র, যা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে’ *(নাজম ৫৩/২৩)*।

٦- وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ- وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ.

**(৬)** ‘তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেই এবং বলে এতো চিরাচরিত জাদু। তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক জিনিস তার লক্ষ্যে পৌঁছবেই’ *(ক্বমর ৫৪/২-৩)*।

٧- وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

**(৭)** ‘ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনো তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মতাদর্শ অনুসরণ কর। বল, আল্লাহ্র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। জ্ঞান প্রাপ্তির পর যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না’ *(বাক্বারাহ ২/১২০)*।

٨- وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.

**(৮)** ‘যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, আপনি যদি তাদের নিকট সমস্ত দলীল পেশ করেন তবুও তারা আপনার ক্বিবলার অনুসরণ করবে না। আর আপনিও তাদের ক্বিবলার অনুসারী নন এবং তারাও পরস্পরের ক্বিবলার অনুসারী নহে। আপনার নিকট জ্ঞান আসবার পর আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন, নিশ্চয় তখন আপনি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন’ *(বাক্বারাহ ২/১৪৫)*।

**হাদীছে নববী :**

٩- عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ.

**(৯)** যিয়াদ ইবনু আলাক্বাহ (রাঃ) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট

আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাবতীয় অপসন্দনীয় স্বভাব, কাজ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে' *(তিরমিযী হা/৩৫৯১; মিশকাত হা/২৪৭১, সনদ ছহীহ)*।

١٠- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثِنْتَانِ وَّسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِيْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ .

**(১০)** মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, ৭২ দল জাহান্নামে যাবে আর একটি দল জান্নাতে যাবে। তারা হ'ল, জামা'আত। আর আমার উম্মতের মধ্যে সত্বর এমন একদল লোক বের হবে, যাদের মধ্যে প্রবৃত্তি পরায়ণতা এমনভাবে প্রবহমান হবে, যেভাবে কুকুরের বিষ আক্রান্ত ব্যক্তির সারা দেহে সঞ্চারিত হয়। কোন একটি শিরা বা জোড়া বাকী থাকে না, যেখানে উক্ত বিষ প্রবেশ করে না। *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৭২, সনদ ছহীহ)*।

١١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَا لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ وَالنَّفْسُ تَهْوَى وَتُحَدِّثُ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ »..

**(১১)** আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক বনী আদম যেনা করে থাকে। কেননা চোখের যেনা চোখ দিয়ে দেখা, হাতের যেনা হাত দিয়ে ধরা, অন্তরের যেনা পরিকল্পনা করা, মুখের যেনা বলা এবং লজ্জাস্থানের যেনা অন্যায় পথে তা ব্যবহার করা *(আহমাদ হা/৮৮২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০৪, সনদ ছহীহ)*।

١٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ.

**(১২)** আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী ও তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হ'ল (১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্র ভয় করা (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে সত্য কথা বলা এবং (৩) সচ্চলতায় ও অসচ্ছলতায় দানের ইচ্ছা পোষণ করা। আর ধ্বংসকারী জিনিসগুলা হ'ল (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক *(বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান হা/৭২৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০২, সনদ হাসান)*।

١٣- عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ طُولُ الْأَمَلِ وَاتِّبَاعُ الْهَوَى فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيُضِلُّ عَنِ الْحَقِّ أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ مُدْبِرَةً، وَالْآخِرَةُ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ.

**(১৩)** আবু আব্দুর রহমান আস-সালামী (রহঃ) বলেন, আলী (রাঃ) কূফায় খুৎবা দেওয়ার সময় বলেন, হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয় নিয়ে বেশী ভয় করি তাহ'ল, অধিক আশা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। কেননা দীর্ঘ আশা আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দেয় আর প্রবৃত্তির অনুসরণ হক্ব পথ অনুসরণে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়া ক্রমান্বয়ে পিছনে সরে যাচ্ছে, আর আখেরাত সামনে এগিয়ে আসছে। দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেকেরই সন্তান রয়েছে। সুতরাং তোমরা আখেরাতের সন্তান হও। কেননা আজ শুধুই আমল বা কাজের সুযোগ রয়েছে। কোন হিসাব দাখিল করতে হচ্ছে না। কিন্তু কাল (পরকালে) শুধুই হিসাব দিতে হবে। আমল করার কোন সুযোগ থাকবে না *(বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান হা/১০১৩০)*।

**মনীষীদের বক্তব্য :**

১. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কিতাবে প্রবৃত্তির কোন স্থান নেই।

২. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, প্রবৃত্তি হ'ল মন্দের ঔষধ, যা অন্তরের সাথে মিশে যায়।

৩. তিনি আরো বলেন, তোমরা প্রবৃত্তি অনুসারীদের সাথে বসবে না, তাদের সাথে ঝগড়া করবে না এবং তাদের কোন কথাও শুনবে না।

৪. ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের সঙ্গে বসো না। কেননা তাদের মজলিসগুলোতে অন্তর থেকে ঈমানের নূর বা জ্যোতি বেরিয়ে যায়, চেহারার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় এবং মুমিনদের হৃদয়ে হিংসা ও রাগের বাসা বাঁধে।

৫. বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথী আর প্রবৃত্তি অনুসরণের শত্রু।

৬. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, সর্বোত্তম জিহাদ হল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

৭. কেউ কেউ বলেছেন, তোমাদের ব্যাপারে আমি প্রবৃত্তিকে সর্বাধিক ভয় করি, যা পেট, লজ্জাস্থান ও প্রবৃত্তির ধ্বংসকে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে।

**সারবস্তু :**

১. প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে আমল নষ্ট হয়ে যায়, যদিও তার পরিমাণ অধিক হয়।

২. প্রবৃত্তির অনুসারীরা শয়তানের অনুসারী এবং আল্লাহ্র শত্রু।

৩. প্রবৃত্তির অনুসরণ করা অধিক পাপের চেয়ে আল্লাহ্র নিকট অসন্তুষ্টির কারণ।

৪. প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হিংস্র পশুতে পরিণত করে, যা থেকে ফিরে আসা খুবই কঠিন।

৫. আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভালবাসতে হবে এবং প্রবৃত্তিপরায়ণা হওয়া থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

# ত্বাগূতের পরিচয় ও পরিণাম

-মুযাফফর বিন মুহসিন

**ভূমিকা :**

‘ত্বাগূত’ নয়, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা ফায়ছালাই হল চূড়ান্ত ফায়ছালা। আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা। তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন কোথায় মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই কোন মানুষ আল্লাহ্র আইন ব্যতীত আল্লাহদ্রোহী ত্বাগূতের রচনা করা কোন আইনকে বিশ্বাস করতে পারে না, মানতেও পারে না।

**ত্বাগূতের পরিচয় :**

‘ত্বাগূত’ অর্থ- সীমালংঘনকারী, বিপদগামী, আল্লাহদ্রোহী, আল্লাহর বিধান লংঘনকারী নেতা, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, শয়তান, মূর্তি, দেবতা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত বিধানের অনুসরণ না করে মানব রচিত আইন বা শয়তানের অনুসরণ করাই হল ‘ত্বাগূত’।[১]

**ত্বাগূতের প্রকার :**

মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ত্বাগূত পাঁচ প্রকার।[২] যেমন :

**(ক)** ইবলীস শয়তান। শয়তান ত্বাগূতদের প্রধান। সে মানুষকে ভ্রষ্টতা, কুফরী, ধর্মহীনতা ও জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

‘যারা কুফরী করে তাদের পৃষ্ঠপোষক হল ত্বাগূত। সে তার অনুসারীদেরকে হেদায়াত থেকে ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। মূলতঃ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে’ *(বাক্বারাহ ২৫৭)*।

**(খ)** আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয়। অথচ আল্লাহ বলেন, যারা ত্বাগূতের পূজা করে তাদের উপর তিনি অভিসম্পাত করেছেন *(মায়েদাহ ৬০)*।

**(গ)** যে ব্যক্তি গায়েবের খবর রাখে বলে দাবী করে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব বা অদৃশ্যের খবর রাখে না। আল্লাহ বলেন, قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ‘হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনের কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না’ *(নামল ৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ ‘যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানেন, তাহলে সে মিথ্যা বলবে’।[৩]

**(ঘ)** যে ব্যক্তি জনগণকে তার ইবাদত করার জন্য আহ্বান জানায়। যেমন ছূফী ও মিথ্যা ত্বরীকাধারী পথভ্রষ্ট ফকীরেরা এই দাবী করে। তারা বলে, বাবার পূজা করলেই সবকিছু পাওয়া যায়। তারা মানুষের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ বিধর্মীদের অবস্থা তুলে ধরে বলেন,

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

‘তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম যাজকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি শুধু আদেশ করা হয়েছে যে, তারা একমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যা অংশীদার স্থির করে, তা থেকে তিনি মহাপবিত্র’ *(তওবা ৩১)*।[৪]

**(ঙ)** আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান প্রত্যাখ্যান করে যে ব্যক্তি মানব রচিত আইন দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে। আল্লাহ তাদের অবস্থা তুলে ধরে বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَكْفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

‘আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা মনে করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতিও তারা বিশ্বাস করে- অথচ তারা তাদের ফায়ছালা ত্বাগূতের কাছে কামনা করে। যদিও তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন ত্বাগূতকে অস্বীকার করে। মূলতঃ শয়তান তাদেরকে দূরতম বিভ্রান্তিতে ফেলতে চায়’ *(নিসা ৬০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا.

---

১. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৫০ পৃঃ।- الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم

২. ফাতাওয়া ফাওযান ২য় খণ্ড দ্রঃ।

৩. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৮০, ২/১০৯৮ পৃঃ, ‘তাওহীদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪।

৪. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২০৮৪৭, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৯৩; তিরমিযী হা/৩০৯৫। – عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ عُنُقِى صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ (اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ. قَالَ أَجَلْ وَلَكِنْ يُحِلُّوْنَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَحِلُّوْنَهُ وَيُحَرِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ فَيُحَرِّمُوْنَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ.

‘যারা ঈমান আনয়ন করে তারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে এবং যারা কুফরী করে তারা ত্বাগূতের রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের এজেন্টদের সাথে সংগ্রাম কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল’ *(নিসা ৭৬)*।

উক্ত ত্বাগূতকে বর্জন করার জন্যই আল্লাহ প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জনপদে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

‘আমরা প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছি এই জন্য যে, তারা যেন নির্দেশ দেন- তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূতকে বর্জন কর’ *(নাহল ৩৬)*।

দুঃখজনক হল, আমরা ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু’-এর অর্থ যেমন বুঝি না, তেমনি ত্বাগূতের অর্থও বুঝি না। অথচ যতক্ষণ ত্বাগূত বা মানব রচিত মতবাদকে অস্বীকার না করা হবে, তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান না নেয়া হবে এবং তাকে উৎখাত ও প্রতিরোধ করার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত না রাখা হবে, ততক্ষণ আল্লাহ্র একত্ব প্রমাণিত হবে না। সুতরাং প্রচলিত মা‘বূদগুলোকে আগে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে হবে, নাকচ করতে হবে। তারপর এক আল্লাহকে স্থান দিতে হবে। কারণ বিষের মধ্যে দুধ ঢেলে কোন লাভ নেই। অনুরূপ আলকাতরার মাঝে ঘি রেখেও কোন ফায়েদা নেই। এ জন্য ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু’-এর অর্থ সে সময় মক্কার মূর্তিপূজারী মুশরিকরা বুঝেছিল। তাই তারা রাসূল (ছাঃ)-কে পাথর মেরেছিল।[৫] তারা বুঝেছিল যে, এই বাক্য উচ্চারণ করলে বাপ-দাদার প্রতিষ্ঠিত জাহেলী যুগের ধর্ম আর চলবে না। সব বাতিল প্রমাণিত হবে।

বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ উক্ত বাক্য অনর্গল উচ্চারণ করে। কিন্তু গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন শিরকী ধর্ম ও মতবাদের আইন-কানূন, নিয়ম-নীতি ও আদর্শ মেনে চলে। অথচ এগুলো সবই ত্বাগূতী বিধান ও শিরকের শিখণ্ডী, যা রাজনীতির নামে চালু আছে। অনুরূপ ছূফীবাদী কুমন্ত্রণা, পীর-মুরীদী ধোঁকাবাজী, মারেফতী শয়তানী, মাযহাবী ফেতনা, তরীক্বার নষ্টামি, ইলিয়াসী ফযীলত ইত্যাদি মতবাদের নীতি-আদর্শ স্রেফ ধর্মের নামে লুকোচুরি। উপরিউক্ত উভয় প্রকার ত্বাগূতী ফায়ছালাকে যতক্ষণ অস্বীকার না করবে, ততক্ষণ কেউ আল্লাহ তা‘আলার শক্ত হাতলকে ধারণ করতে পারবে না *(বাক্বারাহ ২৫৬)*। অতএব ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ছাড়া মুমিনের জন্য অন্য কোন পথ খোলা নেই।

**ত্বাগূতের পরিণাম :**

ত্বাগূতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অর্থই হল শিরক, কুফর ও নাফরমানীর সাথে জড়িত থাকা। এ জন্য মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য মানুষ ত্বাগূতের সাথে জড়িত। তারা নিজেদেরকে ঈমানদার মনে করলেও মূলতঃ শয়তানের আনুগত্য করে থাকে। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে এবং পথভ্রষ্ট করেছে। আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ ‘তাদের অধিকাংশই যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারা তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে’ *(ইউসুফ ১০৬)*। তাই ত্বাগূতের সাথে আপোস করে ঈমানদার হওয়ার দাবী করে কোন ফায়েদা নেই। মনেপ্রাণে ত্বাগূতী আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে বর্জন করলে বিচারের মাঠ সহজ হবে। অন্যথা জাহান্নাম ছাড়া কোন গতি থাকবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ. فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِىْ صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيْهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا. فَيَتَّبِعُوْنَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ أَنَا وَأُمَّتِىْ أَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ...

‘আল্লাহ সমস্ত মানুষকে ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত করে বলবেন, পৃথিবীতে যে যার ইবাদত করেছে, সে যেন আজ তার অনুসরণ করে। তখন যারা সূর্যের পূজা করত তারা সূর্যের অনুসরণ করবে। যারা চন্দ্রের পূজা করত তারা চন্দ্রের অনুসরণ করবে। আর যারা ত্বাগূতের ইবাদত করত তারা ত্বাগূতের অনুসরণ করবে। কেবল এই উম্মত অবশিষ্ট থাকবে। তন্মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের নিকটে এমন আকৃতিতে আসবেন, যা তারা চিনে না। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু (আমার সাথে চল)। তারা বলবে, নাঊযুবিল্লাহ। আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। আর তিনি যখন আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। তখন আল্লাহ তাদের নিকট পরিচিত আকৃতিতে আসবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে হ্যাঁ, আপনি আমাদের রব। এরপর তারা তাঁকে অনুসরণ করবে। এমন সময় জাহান্নামের উপর দিয়ে (ছিরাত) সাঁকো বসানো হবে। আর আমি ও আমার উম্মতই হব এই পথের প্রথম অতিক্রমকারী ...।[৬] হাদীছের পরের অংশে এসেছে, মুনাফিকদের সিজদা করতে বলা হবে, কিন্তু তারা সিজদা করতে পারবে না। তাদের পীঠ তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে।[৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

يُنَادِىْ مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيْبِ مَعَ صَلِيْبِهِمْ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُوْدِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ

৫. আহমাদ হা/১৬৬৫৪, সনদ ছহীহ।

৬. ছহীহ মুসলিম হা/৪৬৯, ১/১০০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৪৮), ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৮; ছহীহ বুখারী হা/৭৪৩৭ ও ৭৪৩৯, ২/১১০৬-১১০৭ পৃঃ ‘তাওহীদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪;; মিশকাত হা/৫৫৭৮, ‘হাশর ও শাফা‘আত’ অধ্যায়।

৭. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭২, ১/১০২ পৃঃ, ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৮।

ابْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لله صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ قَالُوْا نُرِيْدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِىْ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لله صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ نُرِيْدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ...

‘ক্বিয়ামতের দিন সকল দলকে লক্ষ্য করে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবেন, পৃথিবীতে যারা যার ইবাদত করেছে, তারা যেন তার সাথে যায়। এরপর যারা ক্রুশের পূজা করেছিল, তারা ক্রুশের সাথে যাবে। মূর্তিপূজারীরা যাবে মূর্তির সঙ্গে। এছাড়া যারা অন্যান্য মা‘বূদের ইবাদত করেছে, তারা তাদের সাথে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে কেবল তারাই, যারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করেছে। ভাল মানুষ হোক আর খারাপ মানুষ হোক। আহলে কিতাবেরও কিছু মানুষ থাকবে। অতঃপর জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। সেটি থাকবে মরীচিকার মত।

ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র উযায়ের (আঃ)-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহ্র কোন স্ত্রীও নেই, সন্তানও নেই। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আপনি আমাদেরকে পানি পান করান। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। খ্রীস্টানদেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র মসীহর (ঈসা (আঃ)) ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহ্র কোন স্ত্রীও নেই, সন্তানও নেই। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।[৮] ছহীহ মুসলিমে এসেছে, তারা পানি খেতে চাইলে তাদেরকে ঘাটে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা পানির মত ঢেউ খেলবে। এর একাংশ আরেকাংশকে গ্রাস করবে। তারা তখন জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে।[৯]

মুসলিমরা ত্বাগূতকে ভয় করে না। তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশকে উপেক্ষা করে পীর-ফক্বীর, দরবেশ, ইমাম, আলেম, দার্শনিক, পণ্ডিত প্রভৃতি ব্যক্তির আদর্শের অনুসরণ করে থাকে। এ সমস্ত ত্বাগূতই তাদের সম্বল। আল্লাহকে বাদ দিয়ে এ সমস্ত রবের ইবাদত করছে, যা ইহুদী-খ্রীস্টানদের স্বভাব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُوْنَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

‘তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তারা তোমাদের রূযীর মালিক নয়। সুতরাং তোমরা রূযী কামনা কর আল্লাহ্র নিকট এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁরই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(আনকাবূত ১৭)*।

**ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিদান :**

ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ‘যারা ত্বাগূতের পূজা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং আপনি আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন’ *(যুমার ১৭)*। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

‘দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় ভ্রষ্টতা হতে হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করল, সে সুদৃঢ় হাতলকে শক্ত করে ধরল, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী’ *(বাক্বারাহ ২৫৬)*।

**একমাত্র আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণের নির্দেশ :**

ইবাদত, তাক্বওয়া, ভয়, সাহায্য, দু‘আ, বিধান, আইন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাকে গ্রহণ করতে পারলে মুমিন জীবনে সফলতা সুনিশ্চিত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ‘তাদের প্রতি শুধু আদেশ করা হয়েছে, তারা একমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যে অংশীদার স্থির করে, তা থেকে তিনি মহাপবিত্র’ *(তওবা ৩১)*। অন্যত্র বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ ‘তাদেরকে কেবল আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করবে’ *(সূরা বাইয়েনাহ ৫)*।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

‘জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও যমীনের বরকতের উৎস সমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি’ *(আ‘রাফ ৯৬)*।

---

৮. ছহীহ বুখারী হা/৭৪৩৯, ২/১১০৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৯৩২, ১০/৫৭০ পৃঃ), ‘তাওহীদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪।

৯. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭২, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৫১); মিশকাত হা/৫৫৭৮।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা কর না, চন্দ্রকেও নয়; বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হামীম সাজদাহ ৩৭)*। ইবরাহীম (আঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আপোসহীন চিত্তে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ.

'নিশ্চয় তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার ইবাদত কর তার সাথে, আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত না করা পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হল' *(মুমতাহানা ৪)*।

**নবী-রাসূলগণের দৃষ্টান্ত :**

নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের তাওয়াক্কুল ও দ্বীনী দৃঢ়তা এত গভীর ও শক্ত ছিল, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। ইবরাহীম (আঃ) বিপদের মুহূর্তে তাঁর দৃঢ়তা প্রকাশ করছেন এভাবে-

الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ- وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ- وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ- وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ- وَالَّذِيْ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান। আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন এবং আশা করি ক্বিয়ামতের দিন আমার অপরাধ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন' *(শু'আরা ৭৮-৮১)*। চন্দ্র, সূর্য ও তারকা পূজারীদের সামনে নিজের দৃঢ়তা প্রকাশ করে বলেন,

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّوْنِّيْ فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّيْ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ.

'আমার মুখমণ্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর সাথে ঝগড়া করতে লাগলে তিনি বলেন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ। অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে যা কিছু শরীক করছ, আমি ওটাকে ভয় করি না, তবে আল্লাহ যদি কিছু চান। প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে আমার রবের জ্ঞান খুবই ব্যাপক। এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না' *(আন'আম ৭৯-৮০)*।

ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সারাহ যালেম শাসকের কবলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় আস্থার যে নযীর রেখেছেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে অদ্বিতীয়।[১০] তাছাড়া নমরূদের জ্বালানো আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে তিনি মোটেও পরোয়া করেননি *(আলে ইমরান ১৭৩; আম্বিয়া ৬৭-৭০)*।[১১] অনুরূপ মূসা (আঃ) ফেরআউনের করালগ্রাসে পড়ে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা চির ভাস্বর। ফলে আল্লাহ বিশাল সাগরের মাঝ দিয়ে রাস্তা তৈরি করে দেন এবং তাদেরকে পার করে দিয়ে ফেরআউনসহ তার সৈন্য বাহিনীকে ডুবিয়ে মারেন *(শু'আরা ৬১-৬৬)*। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। হিজরতের সময় ঘটে যাওয়া 'গারে ছাওর'-এর দৃষ্টান্ত তার অন্যতম *(তওবা ৪০)*।[১২] রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে সর্বদা যা উচ্চারিত হত, তা তাঁর উম্মতের তাওহীদী চেতনাকে প্রতিনিয়ত উজ্জীবিত করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

'আপনি বলুন! আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তার কোন শরীক নেই, আমাকে এটাই নির্দেশ করা হয়েছে। আর আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি' *(আন'আম ১৬১-১৬৩)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্‌র অধিকার সংরক্ষণ কর, আল্লাহ তোমাকে সংরক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর, তোমার প্রয়োজনে তাঁকে পাবে। যখন তুমি চাইবে তখন আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাইবে। তুমি জেনে রাখ! সমস্ত মানুষ যদি তোমার উপকার করার চেষ্টা করে তারা সক্ষম হবে না, যদি আল্লাহ তা তোমার জন্য নির্ধারণ না করেন। আর যদি সকলে মিলে কোন বিষয়ে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, আর আল্লাহ যদি তা নির্ধারণ না করেন, তাহলে তারা তা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং খাতা বন্ধ করা হয়েছে।[১৩]

---

১০. ছহীহ বুখারী হা/২২১৭, ১/২৯৫ পৃঃ, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০০।

১১. ছহীহ বুখারী হা/৪৫৬৩, ২/৬৫৫ পৃঃ 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা আলে ইমরান ১৭৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা অনুচ্ছেদ।

১২. ছহীহ বুখারী হা/৪৬৬৩, ২/৬৭২ পৃঃ 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা আলে তওবা ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা অনুচ্ছেদ।

১৩. তিরমিযী হা/২৫১৬, ২/৭৮ পৃঃ, 'ক্বিয়ামতের বিবরণ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৯; মিশকাত হা/৫৩০২, সনদ ছহীহ।

# শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

-ইহসান ইলাহী যহীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

**চ. শয়তান মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে :**

শয়তান মানুষের মধ্যে সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে প্রবেশ করে। ফলে সত্য ও ন্যায় কর্ম সম্পদনে তাকে নিরুৎসাহিত করে। দান খয়রাতে আত্মিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন, الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 'শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীল বিষয়ের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিকট হ'তে দয়া ও ক্ষমার অঙ্গীকার করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন অসীম করুণাময়, সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৬৮)*।

**ছ. শয়তান মানুষের মনে প্রভাবশালী লোকদের স্বরণ করিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করতে চায় :**

শয়তান মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দানে ও খারাপ কাজের নিষেধ করতে তাকে নিরুৎসাহিত করে। হক্ব কথায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'নিশ্চয় এই হচ্ছে সেই শয়তান, যে তোমাদেরকে তার অনুসারীদের ভয় প্রদর্শন করে। কিন্তু যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে তাদেরকে ভয় না করে আমাকেই ভয় কর' *(আলে ইমরান ৩/১৭৫)*।

সুধী পাঠক! উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে শয়তান কেবল তাদেরই কাবু করতে পারে, যারা গাইরুল্লাহ্‌র অবিভাবকত্ব গ্রহণ করেছে। শয়তানের কুমন্ত্রণায় ও পথভ্রষ্টতায় তার সঙ্গী হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের উপর শয়তান কোনই প্রভাব বিস্থার করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا 'আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই, কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতপালকই যথেষ্ট' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৬৫)*।

**জ. মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে মুমিনকে জিহাদবিমুখ করতে চায় :**

এটা শয়তানের আরেকটা কর্ম কৌশল। সে মুমিনদেরকে তরবারির ছায়ায় অবিচল থাকতে নিষেধ করে। জিহাদবিমুখী হতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যারা দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন পশ্চাদাবর্তিত হয়েছিল তারা যা অর্জন করেছিল, তার কোন কোন বিষয় হ'তে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করেছিল এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু *(আলে ইমরান ৩/১৫৫)*।

শয়তান মুমিনদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়, যাতে মুজাহিদরা জিহাদের ময়দান থেকে সটকে পড়ে। আর আল্লাহ এমন এক ঘটনা বিকৃত করলেন, যে ওহোদ যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদরা তান্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। আল্লাহ এর মাধ্যমে এমন ভয় থেকে মুমিনদের নিষ্কৃতি দিলেন, যে ভয়টা শয়তান মুজাহিদদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ 'যখন তিনি তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এর দ্বারা তোমাদেরকে পরিত্র করার জন্য এবং তোমাদের হ'তে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূরীভূত করবেন আর তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা অনঢ় করবেন' *(আনফাল ৮/১১)*।

**ঝ. শয়তান সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে তালগোল পাকায়। আর মিথ্যাকে চমকপ্রদ করে উপস্থাপন করে। ফলে তার অনুচররা ভাল-মন্দের বাছ-বিচার করতে পারে না :**

আল্লাহ বলেন, تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। সুতরাং সে আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য আছে পীড়াদায়ক শাস্তি' *(নাহল ১৬/৬৩)*।

বর্তমান যুগে এমন অনেক উদভ্রান্ত ফেরকা আছে যারা মনে করে যে, তারা সঠিক পথেই রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারা গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন , الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا 'তারাই সেই লোক, যাদের প্রচেষ্টা দুনিয়াবী জীবনে ভ্রান্ত হয়েছে, যদিও তারা মনে করে যে তারা সৎকর্ম করছে' *(কাহফ ১৮/১০৪)*।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বিশ্ববিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ কুরআনুল কারীমে 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। শয়তান তাদের কৃতকর্মগুলোকে সুশোভিত করে দেখিয়েছিল। তাদেরকে ভ্রষ্টতার অভাবনীয় উপাদান দান করেছিল। ফলে তাদের ভ্রষ্টতার দরুণ তাদেরকে সত্যপথথেকে ফিরিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ বলেন, وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ 'এবং 'আদ ও ছামূদ তাদের বাড়ি-ঘরই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা প্রদান করেছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ' *(আনকাবূত ২৯/৩৮)*। আল্লাহ তা'আলা

শয়তানের অপতৎপরতার বর্ণনা করতে গিয়ে বিলক্বীসের ঘটনা করে বলেন, وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ '(হুদহুদ পাখি রিপোর্টে বলল,) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে; আর শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে বিরত রেখেছে; ফলে তারা সৎপথ প্রাপ্ত নয়' *(নামল ২৭/২৪)*।

**ঞ. মতানৈক্য, ক্রোধ, যুলুম, মন্দ ধারণা, বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শয়তানের অনুপ্রবেশ :**

শয়তান মানুষকে রাগ-ক্রোধের মাধ্যমে প্রতারিত করে। মূলতঃ পারস্পরিক বিদ্বেষ বিস্তার লাভ করে, অত্যাচার, মতানৈক্য, বিভেদ, বিবাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ-কলহ ইত্যাদির বিস্তার শয়তানের ওয়াস ওয়াসারই ফলাফল। এমন কাজগুলোকে মূসা (আঃ)-এর ভাষায় আল্লাহ শয়তানের কর্মকাণ্ড বলে ঘোষণা দিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ.

'তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক, সেথায় তিনি দু'টি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন, একজন তার নিজগোত্রের অপরজন অপরজন তার শত্রুদলের, মূসা (আঃ) স্বগোত্রের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা (আঃ) তাকে ঘুষি মারলেন; এতেই তার মৃত্যু হ'ল। মূসা (আঃ) বললেন, এটা শয়তানের কাণ্ড সে প্রকাশ্য শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী' *(ক্বাছাছ ২৮/১৫)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ فَيَقَعُ فِى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. 'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র উত্তোলন না করে। কেনান সে জানে না হয়তবা শয়তান অস্ত্র টেনে বের করবে ফলে সে জাহান্নামে পতিত হবে' *(বুখারী হা/৭০৭২)*।

**ট. কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা শয়তারে কাজ। আল্লাহ এর থেকে বেছে থাকবে নির্দেশ দিয়েছেন। এটাকে পাপকর্ম হিসাবে ঘোষণা করেছেন :**

ছাফিয়াহ বিনতে হুয়াই (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِى لِيَقْلِبَنِى وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِى دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا.

রাসূল (ছাঃ) 'ইতেকাফরত ছিলেন। একরাতে তাঁকে দেখতে এসে তার সাথে কথা বললাম। তারপর প্রস্থানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালাম। তিনিও আমার সাথে দাঁড়ালেন বিদায় দেয়ার জন্য। তাঁর বাসস্থান ছিল উমামা বিন যায়েদের ঘরে। অতঃপর দু'জন আনছারী ব্যক্তি অতিক্রম করলেন। তারা নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখে দ্রুত চলতে লাগলেন। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, থাম, ধীরে চল! এই মহিলা হ'ল ছাফিয়াহ বিনতে হুয়াই। দু'জনেই বলে উঠল সুবহানাল্লাহ, ওহে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তপ্রবাহের স্থানেও চলাচল করে। আর আমি আশংকা করলাম যে, তোমাদের অন্তরে সে কোন মন্দ নিক্ষেপ করবে। অপর বর্ণনায় রয়েছে, মন্দ কিছু নিক্ষেপ করবে' *(বুখারী হা/৩২৮১)*।

**ঠ. অলসতা ও অন্তরের রূঢ়তায় শয়তানের অনুপ্রবেশ :**

শয়তান মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদতে নিরুৎসাহিত করতে তার দেহ-কায়াকে অলসতায় নিমজ্জিত রাখে। আর রূঢ় আত্মাকে ছালাত ও আল্লাহ্র যিকর থেকে বিমূখ করার জন্য তার অন্তকে আরও কঠোর করে দেয়। তাই আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, শয়তানের চাকচিক্যের মধ্যে হৃদয়ের রূঢ়তা বিরাজমান। আর তা মানুষকে হক্ব পথ থেকে গোমরাহ করে যদিও সত্য প্রকাশ পেয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 'আপনি তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনান, যাকে আমি আমার নিদর্শন দান করেছিলাম। কিন্তু সে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসে, ফলে শয়তান তার পিছনে লেগে যায়। আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়' *('আরাফ ৭/১৭৫)*।

যে ব্যক্তি সত্য উদঘাটিত হওয়ার পরেও তা প্রত্যাখ্যান করল ও শয়তানের ধোঁকা খেল, সে ক্বিয়ামত দিবসে আফসোসের আগ্রাসনে জ্বলতে থাকবে। শয়তানও তার চেলা-চামন্ড অনুসরণের কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত, অপমানিত ও লজ্জিত হবে। আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا-يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا 'যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। আর শয়তান মানুষের জন্য মহাপ্রতারক' *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৯)*।

**ড. বিগত জাতিদের মধ্যে কঠোর হৃদয়ের অধিকারীরা ক্ষুধা-দারিদ্র আসার পরেও শয়তান তাদের কাজকে সুসজ্জিত করে দেখিয়েছে :**

আল্লাহ বলেন, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি পৌছল, তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করল না? বরং তাদের হৃদয় আরো কঠিন হয়ে গেল, আর শয়তান তাদের কাজকে শোভাময় করে দেখাল' *(আন'আম ৬/৪৩)*।

শয়তান ছালাতে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়। তার যাবতীয় প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যাতে তার ও আল্লাহ্র মাঝের খুশু-খুযূ বিদূরিত হয় ও অমনোযোগী হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِى كَمْ صَلَّى.

'যখন ছালাতের জন্য আযান দেয়া হয় শয়তান বাতকর্ম করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে থাকে, যাতে সে আযান না শুনতে পায়। আযান শেষ হ'লে আবার ফিরে আসে। ইক্বামত দেয়া হ'লে চলে যায়, ইক্বমত শেষ হ'লে আবার ফিরে এসে মুছল্লীর মনে খটকা লাগায় আর বলে, এটা স্মরণ কর। ওটা স্মরণ কর। এভাবে ছালাতেই তার বিভিন্ন জিনিষের উদয় হয়। অবশেষে সে ভুলে যায় সে কত রাক'আত ছালাত আদায় করল' *(বুখারী/৬০৮)*।

এভাবে শয়তান ছোঁ মেরে মুছল্লীর ছালাতে ব্যাঘাত ঘটায়। কোন ব্যক্তি যখন ছালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার কানে পেশাব করে, আর এ কাজের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের আযাবেরে জন্য প্রস্তুত করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

'তোমাদের কেউ যখন বিছানায় নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার নিম্নভাগে ঘাড়ের পশ্চাদ্ভাগে তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রতি গিঁঠ মারার সময়ই বলে, এখনও অনেক রাত আছে, তুমি ঘুমাও। ঘুম থেকে উঠে যদি সে আল্লাহকে স্মরণ করে তবে একটি গিঁঠ খুলে যায়। যদি সে অযূ করে তবে আরেকটি গিঁঠ খুলে যায়। যদি সে ছালাত আদায় করে তবে তার আরেকটি গিঁঠ খুলে যায়। ফলে সে প্রত্যূষে উপনীত হয় প্রফুল্ল মনে, কর্মঠ হয়ে। অন্যথায় সে মন্দ আত্মা নিয়ে অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে সকালে উপনীত হয়' *(বুখারী হা/১১৪২)*।

**ঢ. শয়তান মানুষকে ধর্মীয় বিষয়ে ফিতনায় নিপতিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কুমন্ত্রণা দান করে :**

শয়তান আল্লাহ সম্পর্কে নানাবিধ উদ্ভট কথাবর্তা বল। আল্লাহ্র সমুদয় গুণবাচক নাম নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তর্ক করে তাক্বদীরের বিষয়ে। এগুলো এমনই স্পর্শকাতর বিষয় যে, যদি সে এগুলোতে ঈমান আনয়ন করে ও যা কিছু আল্লাহ্র উপর সমর্পণ করে তবে তার ঈমান নিরাপদে থাকবে। আর যদি শয়তানী বিতর্কে প্রবৃত্ত হয় তবে ঈমান বিধ্বংস হবে। ক্বাদারিয়্যাদের মত তাক্বদীরের ভালমন্দকে অস্বীকার করবে। আশ'আরিয়াদের মত আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহ নিয়ে অপব্যাখ্যা করবে অথবা মু'তাযিলাদের মত আল্লাহ্র গুণবাচক নামগুলোকে বাদ দিবে। আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'আর আল্লাহ্র অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ও ভাল নাম রয়েছে। সতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর, সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মরে প্রতিফল দেওয়া হবে' *('আরাফ ৭/১৮০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ 'কতক মানুষ অজ্ঞানবশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের' *(হজ্জ ২২/৩)*।

সুধী পাঠক! শয়তানের কুমন্ত্রণার আরেকটি ধরণ হ'ল, সে মানুষকে কাফের বানানোর মানসে আল্লাহ্র সাথে সাদৃশ্যতা বা উপমা স্থাপন করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَأْتِى الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. 'তোমাদের কারও কাছে শয়তান এস বলবে, কে এটা সৃষ্টি করল? ওটা কে সৃষ্টি করল? অবশেষে বলবে, কে তোমার প্রভুকে সৃষ্টি করল? যখন এই পর্যন্ত পৌছে, তখন সে আল্লাহ্র সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এমন বাজে কথা থেকে বিরত থাকে' *(বুখারী হা/৩২৭৬)*।

**◈ শয়তানের অনুসারীরা পথভ্রান্ত ও জাহান্নামী :**

আল্লাহ বলেন, كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ 'তার (শয়তান) ব্যাপারে এরূপ নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, যারা তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে' *(হজ্জ ২২/৫৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا 'সে তাদেরকে

প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে। আর শয়তান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না' *(নিসা ৪/১২০)*।

**◈ শয়তানে কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি :**

শয়তানের অসংখ্য-অগণিত সফলতা আছে, যা সে আদম (আঃ) থেকে শুরু করে অদ্যাবধি মানব সন্তানের বিরুদ্ধে সেগুলো বাস্তবায়ন করেছে বা করছে এবং ভবিষ্যতে করবে। অসংখ্য কাজের ধরণ থেকে গুটি কয়েক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া (আঃ) জান্নাত থেকে বহিষ্কারের পাঁয়তারা, দুনিয়ার কষ্টকর স্থানে অবতরণের প্রাণান্তকর চেষ্টা। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছিল শয়তান ইবলীসের অব্যাহত কুমন্ত্রণার ফলে দয়াময় রবের অবাধ্যতা করে নিষিদ্ধ ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে রাযী করানোর মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 'অনন্তর তাদের উভয়কে শয়তান সেখান থেকে পদস্খলিত করল, তৎপরে তারা যেখানে ছিল সেখান হ'তে তাদেরকে বহির্গত করল এবং আমি বললাম, তোমরা নীচে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু এবং পৃথিবীতেই তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্টকালের অবস্থিতি ও ভোগ-সম্পদ রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/৩৬)*।

একারণে মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই নিকৃষ্ট শয়তানের অনুসরণ না করতে দৃঢ়তার সাথে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আল্লাহ ব্যতীত শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জাহান্নামী না হ'তেও আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ 'হে আদম সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফিতনায় জড়িয়ে ফেলতে না পারে, যেরূপ তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্যে বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না, নিঃসন্দেহে শয়তানকে আমি বেঈমান লোকদের বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি' *('আরাফ ৭/২৭)*।

**◈ ত্বাগূতের নিকট বিচারের ফায়ছালা কামনা করা :**

আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান, আইন-কানূন বাদ দিয়ে গায়রুল্লাহ তথা ত্বাগূতের ফায়ছালা গ্রহণ করাও শয়তানী চক্রান্ত। আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহীর বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে অবাধেই চলছে শয়তান সৃষ্ট ত্বাগূতের এই রসম। চূড়ান্ত সত্যের মাপকাঠি, অভ্রান্ত সত্যের ইলাহী উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিত্যাগ করে মুসলিমরা তাদের রব মেনে নিয়েছে ত্বাগূতী শক্তিকে। মুসলিমগণ এখন কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে মনুষ্ক মস্তিষ্ক প্রসূত বিধানের নিকট বিচার-ফায়ছালা কামনা করে থাকে। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا 'তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা ধারণা করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা নিজেদের বিচার শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অবিশ্বাস করে এবং শয়তান ইচ্ছা করে যে, তাদেরকে সত্যের পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে বিভ্রান্ত করে ফেলবে' *(নিসা ৪/৬০)*।

**◈ অভ্রান্ত অহির বিধাননকে বাদ দিয়ে প্রচলিত রসম-রেওয়াজের অন্ধ অনুরসণ :**

শয়তানী কর্মকাণ্ডের অন্যতম উপসর্গ হ'ল তাক্বলীদী গোড়ামী। সঠিক ও সত্য জানার পরও কুরআন-ছহীহ সুন্নাহ থেকে পিছুটান দেওয়া এর অন্যতম আলামত। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ 'যাদের নিকট হেদায়াত স্পষ্ট হবার পরও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়। শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ 'তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দিলে তবুও কি?' *(লুক্বমান ৩১/২১)*।

**◈ অপচয়-অপব্যয় করা শয়তানের কাজ :**

প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচই হ'ল অপচয়। অপব্যয় করা আল্লাহ অপসন্দ করেন। কিন্তু শয়তান পসন্দ করে। তাইতো আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا 'নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বানী ইসরাঈল ১৭/২৭)*।

**◈ মাদক-জুয়ার ছড়াছড়ি শয়তানের কর্মকাণ্ড :**

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্তক করেছেন মদ, জুয়া ইত্যাদি থেকে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, এগুলো অপবিত্র ও পাপের কাজ। এগুলো পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। এগুলো যে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

'হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাদ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ থেকে ও আলাত থেকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনো কি নিবৃত্ত হবে না' *(মায়িদাহ ৫/৯০-৯১)*।

**◊ আল্লাহ্র সৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটানো শয়তানের কাজ :**

মহিলারা যেমন উল্কি এঁকে থাকে, ভ্রু সরু করে দাঁতকে চিকন করে। এমনকি পুরুষরাও করে থাকে। আবার অনেকে ভিক্ষাবৃত্তির জন্যও ভাল মানুষকে পঙ্গু করে থাকে। অনেকে আবার পশু পাখির নাক-কান ছিদ্র করে এসবই এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا '(শয়তান বলে,) আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিব, তাদের পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সৃষ্টির আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হয়' *(নিসা ৪/১১৯)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى مَالِى لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. 'আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হৌক সে সব নারীদের উপর, যারা শরীরে উল্কি অঙ্কন করে এবং যারা অঙ্কন করায়। আর সে সব নারীদের উপর যারা চুল, ভ্রু তুলে ফেলে এবং সেব সব নারীদের জন্য যারা সৌন্দর্যের জন্য সম্মুখের দাঁত কেটে সরু করে, দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরী করে, যা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে। রাবী বলেন, আমি কেন তার উপর অভিশাপ করব না, যাকে নবী করীম (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন? আর আল্লাহ্র কিতাবে আছে, রাসূল তোমাদের যা দেয় তা কবুল কর' *(বুখারী হা/৫৯৩১)*।

**◊ শয়তান দৈহিক ও আত্মিক রোগের বিস্তৃতি ঘটায় :**

দৈহিক ও আত্মিক রোগ জিনদের মাধ্যমে শয়তান বিস্তৃতি ঘটায়। জিনের আঁচড় লাগা, শয়তানের স্পর্শ ও জাদুটোনায় আসর লাগা এসবই শয়তানের মানব বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ 'যারা সূদ-কুসীদ ভক্ষণ করে, তারা ক্বিয়ামত দিবসে দণ্ডায়মান হবে, যে ভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। আইয়ূব (আঃ) শয়তানের খোঁচা থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ 'স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইয়ূবের কথা, যখন সে তার পালকর্তাকে আহ্বান করে বলল, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে' *(ছোয়াদ ৩৮/৪১)*।

জাদু সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে সুলাইমানের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا 'তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরী করেননি, বরং শয়তানই কুফরী করেছিল' *(বাক্বারাহ ২/১০২)*।

**উপসংহার :**

পরিশেষে বলা যায় যে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচরণকারী ইবলীস শয়তান ও তার দোসদের পাতানো ধূম্রজাল থেকে নিজেকে বাঁচাতে হ'লে স্রেফ আল্লাহ্র অবতারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। এখানেই মহান সফলতা। অতএব আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদের *(নাস ১১৪/৬)* কুমন্ত্রণা থেকে হেফাযত করুন-আমীন!!

*[লেখক : বি.এ অনার্স; তৃতীয় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]*

## ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর উপদেশ

❖ পাঁচটি জিনিস থেকে দূরে না থাকা অবধি মানুষের অন্তর নিরাপদে থাকে না। যথা :

☞ শিরক থেকে, যা কি-না তাওহীদের বিরোধী।
☞ বিদ'আত, যা সুন্নাহ্র পরিপন্থী।
☞ লোভ-লালসা, যা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারী।
☞ অলসতা, যা আল্লাহ্র স্মরণের বিপরীত।
☞ প্রবৃত্তি, যা দ্বীনের মধ্যে মশগূল হওয়া এবং খাঁটি মনে ইবাদত করার পরিপন্থী।

এই পাঁচটি বিষয় আল্লাহকে পাওয়ার পথে বাধা। এদের প্রত্যেকটির অধীনে আবার অসংখ্য ভাগ রয়েছে। সেজন্য বান্দাকে সর্বদা আল্লাহ্র নিকট 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম' বা সরল পথের দিশা লাভের জন্য অবশ্যই দো'আ করতে হবে। আল্লাহ্র নিকট বান্দা সরল পথ লাভের জন্য দো'আ থেকে অন্য কোন কিছুর বেশী মুখাপেক্ষী নয়। দো'আ থেকে অধিক উপকারীও অন্য কিছু নেই *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ৫৮-৫৯)*।

# সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

*-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ*

(২য় কিস্তি)

**দো'আ ও আল্লাহ্‌র সাহায্য বন্ধ হওয়া :**

আমাদের এই শিরোনামের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো হ'ল, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। যেমনটি হাদীছের মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَقُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مُرُوا بِالْمَعْرُوف وَانْهَوْا عَنْ الْمُنْكَر مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكُمْ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ.

'আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অসৎ কাজের নিষেধ কর। আমাকে ডাকার পূর্বে আমি তোমাদের ডাকে সারা দিব না। আমার কাছে কিছু চাওয়ার পূর্বে তোমাদের কিছুই দিই না। আমার কাছে সাহায্য চাওয়ার পূর্বে তোমাদের কোনই সাহায্য করি না'।[১৪]

অন্য শব্দে হুযায়ফা (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَر أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِه ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ 'যার হাতে আমার আত্মা ঐ সত্তার শপথ! অবশ্যই তোমরা ভালকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজের নিষেধ করবে, নইলে অচিরেই আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি প্রেরণ করবেন, তখন তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন না'।[১৫]

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাই আমাদের উচিত, তাদের উপর যে বিপদ-আপদ এসেছে, তা আমাদের উপর আসার আগেই সাবধান হওয়া। কিছু হাদীছে এসেছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মতো আবশ্যকীয় বিষয়টিকে অবহেলা ও অনাগ্রহ দেখনো দো'আ প্রত্যাখ্যান ও আল্লাহ্‌র সাহায্য বন্ধের কারণগুলোর একটি। যেমনটি আমরা আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই যরূরী বিষয়টি ছেড়ে দেওয়ার কারণে এটি বড় বিপদ ও শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার কারণে মুসলিমগণ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে, দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের উপর শত্রুরা প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের দো'আও কবুল করা হয়নি। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই, কোন যোগ্যতাও নেই।

**সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের হুকুম :**

◈ কখনো কখনো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মত আবশ্যকীয় বিষয়টি ফরযে আইন হয়ে দাঁড়ায়। যখন সকল মানুষ অন্যায় কাজ হ'তে দেখে এবং তারা ব্যতীত সেখানে তা প্রতিহত করার অন্য কোন লোক না থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের উপর নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উক্ত অন্যায় কাজ প্রতিহত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. 'তোমাদের যেকেউ কোন অপসন্দনীয় (কথা বা কর্ম) দেখলে সে যেন হাত দ্বারা বাধা প্রদান করে। (হাত দ্বারা বাধা প্রদান) সম্ভব না হ'লে যেন কথার মাধ্যমে বাধা প্রদান করে। এটাও সম্ভব না হ'লে সে যেন অন্তর থেকে ঘৃণা করে। আর এটিই হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান'।[১৬]

◈ কোন গোত্র, গ্রাম বা শহরে যদি অন্যায় কাজ হয়, আর সেখানে মুসলিমদের একটি জামা'আত উপস্থিত থাকে, তাহলে তাদের যে কেউ ঐ অন্যায় কাজ প্রতিহত করলে গোটা জামা'আতের পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে এবং তারা প্রতিদান লাভের মাধ্যমে সফলকাম হবে। আর যদি তাদের কেউই তা আদায় না করে, তাহ'লে অন্যান্য ফরযে কেফায়াহর মত সকলেই গোনাহগার হবে।

◈ কোন গ্রাম বা শহরে যদি একজন আলেম ছাড়া অন্য কেউ না থাকে, তখন তার উপর আবশ্যক হ'ল, সে সাধ্যমত মানুষকে শিক্ষা দিবে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকবে এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। যেমনটি আমরা পূর্বের হাদীছগুলো থেকে জেনেছি। মহান আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوْا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা আল্লাকে সাধ্যমত ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

**ধৈর্যধারণ ও আশাবাদী হওয়া :**

আলেম-ওলামা, দাঈ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে আল্লাহ যাকে ধৈর্যধারণ ও আশাবাদী হওয়ার তাওফীক্ব দিয়েছেন, সে মুক্তি পেয়েছে, আল্লাহ্‌র তাওফীক্ব পেয়েছে এবং আল্লাহ এর দ্বারা তাকে উপকৃত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট' *(ত্বালাক্ব ৬৫/২-৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন' *(ত্বালাক্ব ৬৫/৪)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

---

১৪. আহমাদ হা/২৫২৯৪, সনদ ছহীহ।

১৫. আহমাদ হা/২৩৩৪৯; তিরমিযী হা/২১৬৯ 'ফিতান' অধ্যায়-৯; ছহীহুল জামে' হা/৭০৭০, সনদ হাসান।

১৬. ছহীহ মুসলিম হা/১৮৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০১৩; মিশকাত হা/৫১৩৭।

تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগল দৃঢ় করবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

'কালের কসম। নিশ্চয় সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং ছবরের' *(আছর ১০৩/১-৩)*।

ঈমানদার, সৎআমল সম্পাদনকারী, হক্ব ও ধৈর্যের উপদেশ দানকারী ব্যক্তিরাই দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ও লাভবান। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, হক্ব ও ধৈর্যের উপদেশ প্রদান তাক্বওয়ারই অন্তর্গত বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এখানে এক উপদেশ প্রদানের সাথে খাছ করেছেন, স্পষ্ট ও উৎসাহ প্রদানের জন্য। এথেকে উদ্দেশ্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, আল্লাহ্র পথে আহ্বান ও এর উপর ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি পরিপূর্ণ সফলকাম ও চিরস্থায়ী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্তর্গত হবে, যখন সে এর উপর মৃত্যুবরণ করবে। মহান আল্লাহ এই সকল মহান গুণাবলীকে আঁকড়ে ধরার তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা' *(মায়েদা ৫/২)*।

**আল্লাহ্র দ্বীনকে পূর্ণ অনুধাবন ও গবেষণা করা :**

হে মুসলিম ভাই! তোমার জন্য দ্বীনের পূর্ণজ্ঞান ও বুঝের সাথে সৎকাজের পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। একইভাবে অন্যায় কাজকেও তোমাকে চিনতে হবে। অতঃপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিধানকে মেনে চল। (আর জেনে রাখ) দ্বীনের গভীর জ্ঞান আর বুঝ লাভ করা সৌভাগ্যের প্রতীক এবং আল্লাহ যে ঐ বান্দার কল্যাণ চান তার প্রমাণ। মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূর (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ 'মহান আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন'।[১৭]

আপনি যখন একজন ব্যক্তিকে ইলমের মজলিসে নিয়মিত দ্বীনের প্রশ্ন ও দ্বীনকে গভীর পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করতে দেখবেন, ধরে নিবেন, আল্লাহ এর দ্বারা তার কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন। তখন তার জন্য যরূরী হ'ল, একে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরা ও এ নিয়ে গবেষণা করা। সে কোনভাবেই যেন এ ব্যাপারে বিরক্ত ও দুর্বলতা প্রকাশ না করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন'।[১৮] দ্বীনী ইলম অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে জিহাদের চেয়েও বেশী গুরুত্বের দাবী রাখে। এটি মুক্তির কারণ এবং কল্যাণের দলীল সমূহের একটি। ইলমের মজলিসে উপস্থিত হওয়া, উপকারী কিতাব সমূহ অধ্যয়ন, খুৎবা, ওয়ায-নছীহত ও দ্বীনী আলেমদের কাছে প্রশ্ন করার মাধ্যমে এই দ্বীনী ইলম অর্জন করা যেতে পারে। এ গুলোই দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের উত্তম পন্থা।

◈ দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন কুরআনুল কারীম মুখস্থ করার মাধ্যমেও হ'তে পারে। এ গ্রন্থই ইলমের মূল উৎস, মূল ভিত্তি এবং আল্লাহ্র মযবুত রশ্মি। এটি মহান ও মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি সৎকাজের দিকে আহ্বান ও অসৎকাজ থেকে বারণের উত্তম কৌশল। সুতরাং প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর কাছে আমার আবেদন, তারা যেন কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে যত্নবান হয়, তা বেশী বেশী তেলাওয়াত করা এবং এর সহজবোধ আয়াতগুলো বুঝে, গবেষণার সাথে আয়ত্ত করতে আগ্রহী হয়। কেননা এ মহাগ্রন্থের মধ্যে পথ-নির্দেশনা ও আলোকরশ্মি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ 'এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ 'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। তিনি আরো বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। অতএব আমাদের উচিত গভীরভাবে অনুধাবন, গবেষণা, জটিল বিষয়গুরোর ব্যাপারে প্রশ্ন করা এবং আমলের সাথে এই কুরআনকে তেলাওয়াত ও আয়ত্ত করা।

(সুধী পাঠক!) একইভাবে সুন্নাতে রাসূলের ব্যাপারেও আমাদের যত্নবান হ'তে হবে। যা শরী'আতের দ্বিতীয় ওহী, দ্বিতীয় মূল উৎস এবং পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকার। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হ'ল, নিজ সামর্থ্য ও জ্ঞান অনুযায়ী এ দু'টিকে অধ্যায়ন ও আয়ত্ত করা। এর সাথে ইমাম নববীর 'হাদীছে আরবাঈন' মুখস্থ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ইবনু রজবের 'হাদীছে খামসিন' আরো পূর্ণতা দিতে পারে। কেননা এটি খুবই উপকারী ও ব্যাপক অর্থবহ সংকলন গ্রন্থ। অতএব প্রত্যেক নারী-পুরুষের তা আত্মস্থ করা উচিত।

এ ধরনের আরো গ্রন্থ যেমন হাফিয আব্দুল গণি আল-মাক্বদেসীর 'উমদাতুল হাদীছ'। একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ, যাতে চার শতাধিক হাদীছ একত্রিত করা হয়েছে। যা ইলম বিষয়ে রচিত সর্বাধিক ছহীহগ্রন্থ। এটি যদি কারো পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই তা মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বড় নে'মত হবে।

---

১৭. ছহীহ বুখারী হা/৭১; ছহীহ মুসলিম হা/২৪৩৬; মিশকাত হা/২০০।

১৮. ইবনু মাজাহ হা/২২৩; তিরমিযী হা/২৬৪৬, সনদ ছহীহ।

এভাবে ইবনু হাজার আসক্বালানী প্রণীত ‘বুলূগুল মারাম’ গ্রন্থটি খুব সংক্ষিপ্ত ও উপকারী সংকলন। এটি যদি দ্বীনী ইলম পিপাসুদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, তবে তা অতি উত্তম হয়। একইভাবে আক্বীদা সম্বলিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব প্রণীত ‘কিতাবুত তাওহীদ’ ও ‘কিতাবু কাশফিশ শুবহাত’ গ্রন্থ দু’টি অতি মূল্যবান। এছাড়াও শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহর ‘আল-আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বিয়্যাহ’ গ্রন্থটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদা বিষয়ে লেখা অতি চমৎকার একটি গ্রন্থ। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব প্রণীত ‘কিতাবুল ঈমান’ গ্রন্থটি সকল ঈমান সম্পর্কিত হাদীছের সংকলন গ্রন্থ হিসাবে খুবই উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। অতএব ইলম অন্বেষীক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পবিত্র কুরআন বেশী বেশী তেলাওয়াত ও আয়ত্ত করার প্রতি যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি এ সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থগুলো বা অনুরূপ আরো কিছু সহজবোধ্য দ্বীনি গ্রন্থ আয়ত্ত করা উচিত। একইভাবে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে এ বিষয়গুলো নিয়ে পরস্পর আলোচনা-সমালোচনা করা এবং যে সকল আলেম-ওলামা এবিষয়গুলোতে ভাল পারদর্শী, জটিল বিষয়ে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়ার প্রতিও যত্নবান হ’তে হবে। সর্বোপরি মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওফীক্ব ও সাহায্য কামনা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা ও অলসতা দেখানো মোটেও উচিত হবে না। সময়কে মূল্যায়ন করবে এবং তার দিনের সময় নিম্নোক্ত অংশে ভাগ করে নিবে :

(১) রাত-দিনের কিছু সময়কে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও তার গবেষণায় ব্যয় করবে।
(২) কিছু সময় দ্বীন শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বরাদ্দ রাখবে। এর মধ্যে কুরআন-হাদীছের মূল মতন আয়ত্ত করা এবং জটিল বিষয়গুলো বার বার অধ্যয়ন করা যেতে পারে।
(৩) আর কিছু সময় পরিবারের সাথে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করবে।
(৪) কিছু সময় ছালাত, ইবাদত-বন্দেগী, নানা ধরনের দো‘আ ও যিকিরের জন্য বরাদ্দ রাখবে।

এছাড়াও نُوْرٌ عَلَي الدَّرْبِ নামক টিভি চ্যানেলের বিভিন্ন ইসলামিক প্রোগ্রাম শোনা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেশ উপকারী হবে। এর প্রোগ্রামগুলো জ্ঞান পিপাসু ও সাধারণ মানুষের জন্যও বেশ উপকারী। কেননা এতে পূর্ববর্তী অনেক মাশায়েখের গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ প্রশ্নোত্তর প্রচার করা হয়। তাই এর উপকারী প্রোগ্রামগুলো খুব গুরুত্বের সাথে শোনা উচিত। এই অনুষ্ঠানটা প্রতিরাতে মাগরিব থেকে এশার মধ্যে সাড়ে নয়টা নাগাদ نِدَاءُ اْلاَسْلَام বেতার তরঙ্গ থেক পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা হয়।

আমি আল্লাহ্র কাছে তাঁর সুন্দর নাম সমূহ ও গুণাবলীর দ্বারা এ প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে সকল মুসলিমকে উপকারী ইলম হাছিল ও সৎ-আমল করার তাওফীক্ব দান করেন। তিনি যেন আমাদের তাঁর দ্বীনের সঠিক বুঝ এবং তার উপর অটল থাকার তাওফীক্ব দান করেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের ও সকল মুসলিম নেতাদের সোচ্চার হওয়ার এবং এর উপর ধৈর্যধারণ করার তাওফীক্ব দান করেন। যাদের কাছেই এ মহান কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তারা যেন নির্দিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত কল্যাণের প্রতি অটল থাকতে পারে। আর তিনি যেন সকলকে যথাযথভাবে এর হক্ব আদায় করার তাওফীক্ব দান করেন। আল্লাহ ও তার সকল বান্দার জন্য কল্যাণ কামনা করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা দাতা ও দয়ালু। অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর। তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল ছাহাবীর প্রতি এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের পথ অনুসরণ করবে তাদের উপর।

**উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা :**

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য, ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্র রাসূল, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর ছাহাবীগণের প্রতি।

হে উপস্থিত মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! প্রত্যেক সুস্থ বিবেকের কাছে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক জাতির জন্য একজন পথপ্রদর্শক যরূরী, তিনি তাদেরকে সত্যের পথ দেখাবেন। আর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি বেশী অগ্রগামী। তাই আজ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী উপদেশ ও পথ-নির্দেশনার সুবাতাস সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। যাতে তিনি তার উপর আপতিত দায়িত্ব থেকে যিম্মামুক্ত হ’তে পারেন এবং এর দ্বারা অন্যরা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ‘আপনি বুঝাতে থাকুন; কেননা এই বুঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে’ *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শুধু প্রত্যেক মুমিনের উপর নয় প্রত্যেক মানুষের উপর আল্লাহ ও তাঁর বান্দার হক্ব সম্পর্কে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান খুব যরূরী। সাথে সাথে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ প্রদান। মহান আল্লাহ তাঁর স্পষ্ট কিতাবে লাভবানদের প্রশংসিত আমল ও ক্ষতিগ্রস্তদের নিন্দনীয় চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ আলোচনা তিনি পবিত্র কুরআনের বহু জায়গাতে করেছেন। যার সমষ্টি পবিত্র কুরআনের সূরা আছরে এভাবে বিধৃত হয়েছে,

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

‘কালের কসম। নিশ্চয় সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং ছবরের’ *(আছর ১০৩/১-৩)*।

মহান আল্লাহ এই ছোট্ট মূল্যবান সূরাতে লাভবান হওয়ার মোট চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যথা : (ক) ঈমান (খ) সৎআমল (গ) হক্বের উপদেশ (ঘ) ছবরের উপদেশ।

অতঃপর যে ব্যক্তি এ চারটি স্তর পূর্ণ করবে সে মহালাভবান ও সফলকাম হবে। সে ক্বিয়ামতের দিন তার প্রতিপালকের কাছ থেকে মহান মর্যাদা ও স্থায়ী সফলতা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন না করবে, সে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ঘর জাহান্নামের অধিকারী হবে। উক্ত সূরায় আল্লাহ তা‘আলা লাভবান ব্যক্তির গুণাবলীগুলো উল্লেখ করেছেন, যাতে

নাজাত প্রত্যাশীরা তা চিনতে পারে, সে বৈশিষ্ট্যগুলো নিজেরা গ্রহণ করতে পারে এবং সেদিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে পারে। একইভাবে তিনি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ক্ষতিগ্রস্তদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, যাতে মুমিনরা তা চিনতে পারে এবং তা থেকে দূরে থাকতে পারে। আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে গবেষণা এবং বেশী বেশী তেলাওয়াতের মাধ্যমে লাভবান ও ক্ষতিগ্রস্তদের বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে জানা যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ‘এই কুরআন এমন পথপ্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ‘এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াত সমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ‘এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি মঙ্গলময় করে অবতীর্ণ করেছি। অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর যাতে তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও’ *(আন‘আম ৬/১৫৫)*। ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ‘তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়’।[19] এছাড়াও রাসূল (ছাঃ) ‘আরাফার ময়দানে লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে বলেছিলেন, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ ‘আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ’ল আল্লাহ্র কিতাব’।[20]

সুধী পাঠক! মহান আল্লাহ এ সকল আয়াতে স্পষ্ট করলেন যে, তিনি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তার বান্দারা একে নিয়ে গবেষণা করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে। আর তাকে অনুসরণ করে এবং সৌভাগ্য ও সম্মানের পথ-নির্দেশনা লাভের সাথে সাথে পারলৌকিক মুক্তি লাভ করতে পারে। আর রাসূল (ছাঃ)ও এই কুরআন শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনের ধারক-বাহকরাই উত্তম মানুষ। যারা নিজেরা কুরআন শিক্ষা করে এবং এর প্রতি আমল ও অনুসরণের পাশাপাশি অপরকেও শিক্ষা দেয় তার নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে, তার হুকুম মেনে চলে এবং তার কাছেই যাবতীয় বিষয়ের ফায়ছালা তালাশ করে। ‘আরাফার দিনে মহা মিলনমেলায় রাসূল (ছাঃ) এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট করেছেন যে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র কিতাবকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তাঁর সকল শিক্ষাকে গ্রহণ করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর যখন থেকে এই উম্মতের সালাফে ছালেহীন ও প্রথম যুগের মত চলা শুরু করেছে, তখন থেকে আল্লাহ তাদের সম্মানিত করেছেন, তাদের মর্যাদা উঁচু করেছেন, পৃথিবীতে তাদের নেতৃত্বদান করেছেন। সর্বোপরি তাদের সাথে কৃত ওয়াদা আল্লাহ পূর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

‘তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না’ *(নূর ২৪/৫৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ‘হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করবেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ- الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

‘আল্লাহ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ্য দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে। যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত’ *(হজ্জ ২২/৪০-৪১)*। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

***[লেখক : তৃতীয় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]***



১৯. ছহীহ বুখারী হা/৫০২৭।
২০. মুসলিম হা/১২১৮, ‘হাজ্জ’ অধ্যায়-১৯।

# কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা

-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী

**ভূমিকা :**

সমস্ত আমল বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সঠিক ঈমানের উপর নির্ভরশীল। মানব জাতির ঈমান ও আক্বীদা বিশুদ্ধ না করলে কোন আমলই আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। এজন্য কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝের মাধ্যমে সঠিক আক্বীদা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ঈমান সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা পোষণ করতে হবে। আর ঈমানের অনেক শাখা রয়েছে, সেগুলো জেনে বাস্তব জীবনে আমল করতে হবে, তাহলে ইহকালে কল্যাণ ও পরলোক মুক্তি মিলবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখাগুলো আলোকপাত করা হ'ল।

**(১) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা :**

মহান আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّه 'মুমিনগণ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّه 'হে মুমিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র প্রতি' *(নিসা ৪/১৩৬)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّه 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এ কথা বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যে তা বলল, সে আমার পক্ষ থেকে তার সম্পদ ও জীবন নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিধান লংঘন করলে (শাস্তি দেওয়া যাবে) আর তার অন্তরের গভীর (পাপ লুকানো থাকলে তার) হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র যিম্মায়'।[২১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি একথা জানা অবস্থায় মারা গেল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই, তাহলে সে জান্নাত প্রবেশ করবে'।[২২]

এর অর্থে এই নয় যে, শুধু আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করবে এবং জানবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। অতঃপর চুপ করে বসে থাকবে। এটা চলবে না। বরং তাকে অবশ্যই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, শিরক-বিদ'আত থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী শরী'আতের হুকুম-আহকাম মানার চেষ্টা করতে হবে। আর সালাফে ছালেহীনের পথ অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই সুখময় জন্নাতের আশা করা যাবে, নচেৎ নয়।

**(২) রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা :** মহান আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِه 'মুমিনগণ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগনের প্রতি' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*। হাদীছে জিবরীলে রাসূল (ছাঃ)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বলেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. 'আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি, এবং ভাগ্যের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা'।[২৩]

(৩) ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।[২৪]

**(৪) কুরআন এবং পূর্ববর্তী নাযিলকৃত সকল আসমানী গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা :** মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি, যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি, যা পূর্বে অবতীর্ণ করেছিলেন' *(নিসা ৪/১৩৬)*।[২৫]

**(৫) তাক্বদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে মর্মে বিশ্বাস করা :** মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّه 'আপনি বলুন, সব কিছুই আল্লাহ্র নিকট হতে হয়' *(নিসা ৪/৭৮)*। ভাগ্যের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য সকল কিছুই আল্লাহ্র নিকট হতে হয়ে থাকে।[২৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ ثُمَّ تَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ.

'আদম (আঃ) ও মূসা (আঃ) তর্ক-বিতর্ক করছিলেন, তখন মূসা (আঃ) তাঁকে বললেন, আপনি সেই আদম, যে আপনার ভুল আপনাকে জান্নাত হতে বের করে দিয়েছিলেন। আদম (আঃ) তাঁকে বললেন, আপনি সেই মূসা যে, আপনাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দান এবং বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। এরপরও আপনি আমাকে এমন বিষয়ে দোষী করছেন, যা আমার সৃষ্টির আগেই আমার জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দু'বার বলেছেন, এ বিতর্কে আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর উপর বিজয়ী হন'।[২৭]

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'মানব জাতি পাপ-পঙ্কিলতা, অন্যায়-অপকর্ম করে তাক্বদীরের দোষ দিবে এমনটি ঠিক নয়। আদম (আঃ) মছীবতে পড়েছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণও করেছিলেন। অপরপক্ষে নিজের ভুলের জন্য আল্লাহ্র নিকট তওবাও করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়াছিলেন। অতএব মানব জাতি যখন কোন বিপদে-মুছীবতে

২১. আহমাদ হা/ ১১৭; বুখারী হা/ ১৩৯৯; মুসলিম হা/২০।
২২. মুসলিম হা/২৬।
২৩. মুসলিম হা/৮; বুখারী হা/৫০; মিশকাত হা/২।
২৪. সূরা বাক্বারাহ ২/২৮৫; মুসলিম/৮; বুখারী হা/৫০; মিশকাত হা/২।
২৫. সূরা বাক্বারাহ ২/২৮৫; মুসলিম/৮; বুখারী হা/৫০; মিশকাত হা/২।
২৬. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/১৬৭।
২৭. বুখারী হা/৩৪০৯; আহমাদ হা/ ৭৫৮৮; মুসলিম হা/২৬৫২।

পড়বে তখন আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থেকে সেটিকে গ্রহণ করা কর্তব্য । আর মানব জাতির উচিত নয় যে, সে পাপ করবে, আর যদি কোন ত্রুটি থাকে আল্লাহ্র নিকট তওবা করবে। আর বিপদ মুছীবতের উপর ধৈর্যধারণ করে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর' *(মুমিন ৪০/৫৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না' *(আলে ইমরান ৩/১২০)* ।[২৮]

**(৬) পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা :** মহান আল্লাহ বলেন, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ 'যেসব আহলে কিতাব আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না এবং পরকালের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে না তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর' *(তওবা ৯/২৯)*। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'যে সমস্ত কাফের আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না তাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন'।[২৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا.

'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। আর যখন লোকজন তা দেখবে, তখন সকলেই ঈমান আনবে। তখন তার ঈমান কাজে আসবে না। ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমান এনে নেক কাজ করেনি। (ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে (এ অবস্থায় ) যে, দু'ব্যক্তি ( বেচা-কিনার ) জন্য পরস্পরের সামনে কাপড় ছাড়িয়ে রাখবে। কিন্তু তারা বেচাকিনার সময় পাবে না। এমন কি তা ভাঁজ করার সময়টিও পাবে না। আর ক্বিয়ামত (এমন অবস্থায়) অবশ্যই সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি তার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করে রওয়ানা হবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ পাবে না। আর ক্বিয়ামত (এমন অবস্থায়) সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (তার পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরী করবে কিন্তু তা থেকে পানি পান করানোর সময়ও পাবে না । আর ক্বিয়ামত (এমন অবস্থায়) কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোকমা উঠাবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার সুযোগ পাবে না'।[৩০] অতএব হে মানব জাতি! পরকালের জন্য নিজের সুখের আগে সৎ আমল প্রেরণ কর।

সুধী পাঠক! পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। আর পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কয়েকটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। যথা :

**(ক) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি সিশ্বাস স্থাপন করা :** মহান আল্লাহ বলেন, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ 'কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, নিশ্চয় হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে' *(তাগাবুন ৬৪/৭)*। মহান আল্লাহ বলেন, قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ 'বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে ক্বিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই' *(জাছিয়া ৪৫/২৬)*। রাসূল (ছাঃ)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ 'ঈমান হ'ল, তুমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ভাগ্যের সংঘটিত সকল কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে'।[৩১]

**(খ) মানব জাতি কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে জমা হবে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা :** মহান আল্লাহ বলেন, أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 'তারা কী চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সে মহান দিবসে, যেদিন সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে' *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/৪-৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ 'যেদিন সব মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে' আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তির কানের লতি পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে'।[৩২]

**(গ) এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মুমিনদের থাকার স্থান হবে জান্নাত এবং কাফেরদের থাকার স্থান হবে জাহান্নাম :** মহান আল্লাহ বলেন, بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'হ্যাঁ, যারা পাপ অর্জন করেছে এবং স্বীয় পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। বস্তুত, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী বসবাস করবে এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে তারাই অধিবাসী। তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে' *(বাক্বারাহ ২/৮১-৮২)*।

ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুন কয়েকদিন মাত্র স্পর্শ করবে অথবা চল্লিশ রাত্র। তারপর তারা মুক্তি পেয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'বিষয়টি এরূপ নয়, যেমনটি তোমরা মনে করছ অথবা চাচ্ছ। বরং তাহ'ল, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র নাফরমানি করে, পাপকর্ম করে, পাপ বেষ্টিত হয়ে

২৮. ইবনু আবিল ইয আল-হানাফী, তাহযীব শরহ আত-তাহাবী (বৈরুত : দারুস সাহাবা, মুদ্রন ৫ম ১৪২১ হি), পৃঃ ৩২৩।
২৯. তাফসীরে কুরতুবী ৮/১০১।
৩০. আহমাদ হা/৮৮১৪; বুখারী হা/৬৫০৬; মুসলিম, হা/২৯৫৪; মিশকাত হা/৫৪১০।
৩১. মুসলিম হা/১০; আহমাদ হা/৯৪৯৭; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২২৪৪।
৩২. আহমাদ হা/৫৮২৩; বুখারী হা/৪৯৩৮; মুসলিম হা/২৮৬২।

পড়ে, তাকে ক্বিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তার কোন সৎ আমল থাকবে না, বরং তার সকল আমলই পাপের কাজ। এ জন্যই সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সেখানেই চিরস্থায়ী বসবাস করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান এনেছে ও সৎ আমলগুলো রাসূলের অনুসরণ-অনুকরনের মাধ্যমে করেছে সেই হবে জান্নাতের অদিবাসী। সেখানে চিরস্থায়ী বসবাস বরবে। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন, না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়। যে অসৎ কাজ করবে, সে তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহ্র পরিবর্তে কাউকেও বন্ধু এবং সাহয্যকারী পাবে না । পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ আমল করবে এবং সে বিশ্বাসীও হবে, তবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা খেজুর কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না' *(নিসা ৪/১২৩-১২৪)*।[৩৩]

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধায় তার অবস্থানস্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে তাকে জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জান্নামীদের (অবস্থানস্থল দেখানো হয়) এবং তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থানস্থল, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করা অবধি'।[৩৪]

**(৭) এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসা সবার উপর ওয়াজিব :** মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 'আর মানব জাতির মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্র মোকাবেলায় অপরকে সমকক্ষ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসাার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবেসে থাকে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ্র প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তর' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*।

সুধী পাঠক! আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকগণের দুনিয়াবী অবস্থা এবং পরকালে কী হবে তার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ তারা আল্লাহ্র স্থানে অন্যদেরকে ভালবাসতে এবং তাদের ইবাদাত করতে শুরু করে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। মহান আল্লাহ্র জন্য সকল ইবাদত করতে হবে, তাঁর কোন শরীক নেই। অব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ 'আল্লাহ্র নিকট থেকে বড় গুনাহ কোন্টি? তিনি বলেন, আল্লাহ্র সাথে অন্যকাউকে অংশীদার স্থাপন করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'।[৩৫]

অতএব আল্লাহ্র জন্যই সকল ভালবাসা হতে হবে,তাঁর উপর আশা ভরসা করতে হবে, তাঁর জন্যই কেবল ইবাদত করতে হবে, তাঁর দিকেই সকল বিষয়ে রূজু' হতে হবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না, যারা মুশরিক তারা নিজের উপর নিজেরাই যুলুম করছে, যার প্রতিফর ইহকালীন জীবনে এবং পরকালে অচিরেই পাবে।[৩৬] আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ 'তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া। কাউকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসা। কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকেও বেশি অপসন্দ করা'।[৩৭]

**(৮) এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহকে ভয় করা সবার উপর ওয়াজিব :** মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তাদেরকে ভয় কর না। কেবল আমাকেই ভয় কর' *(আলে ইমরান ৩/১৭৫)*। অতএব তোমরা যে কোন চিন্তাই পড় না কেন কেবল আল্লাহকেই ভয় কর। কোন পীর-ফকীরের নয়, কোন মাযারের ভয় নয়, কোন মানুষের ভয় নয়, কোন শয়তানের ভয় নয়। মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 'অতএব তোমরা মানুষকে ভয় কর না, বরং শুধু আমাকেই ভয় কর' *(মায়েদা ৬/৪৪)*। তিনি আরো বলেন, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ 'তোমরা শুধুমাত্র আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/৪০)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ 'তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত' *(আম্বিয়া ২১/২৮)*। মহান আল্লাহ ইয়াহইয়া (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বলেন, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 'তাঁরা আমাকে ডাকতেন আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিলেন আমার নিকট বিনীত' *(আম্বিয়া ২১/৯০)*।

মুমিন ব্যক্তিরাই আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বিচার দিবসকে ভয় করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ 'তারা ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবের দিবসকে' *(রা'দ ১৩/২১)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সামানে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি বাগান' *(আর-রাহমান ৫৫/৪৬)* । যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে, তাঁর সামনে যাওয়ার ভয়ে, মহান আল্লাহ যে সমস্ত কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকে, আর যা করতে আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়ন করে, সকল ইবাদত তাঁরই জন্য করে। এর জন্য তাকে দু'টি জান্নাত দিবেন একটি নিষেধ কৃতকর্ম পরিত্যাগ করার জন্য, অপরটি সৎ আমল করার জন্য'।[৩৮]

---

৩৩. তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৪৭১।
৩৪. আহমাদ হা/৫৯২৬; বুখারী হা/১৩৭৯; মুসলিম হা/২৮৬৬; ইমাম বাইহাকী, আল-জা'মী, লিশু'য়াবিল ইমান ১/৫৬০; তাহকীক: ড: আব্দুল্লাহ আল-আলী আব্দুল্লাহ হামীদ, আকতাব রুশদ, ১ম সস্করণ , ১৪৩৩ হিঃ।
৩৫. আহমাদ হা/৪১৩১; বুখারী হা/৪৪৭৭; মুসলিম হা/৮৬।
৩৬. তাফসীর ইবনে কাছীর হা/১৪২।
৩৭. আহমাদ হা/১২০০২; বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/ ৪৩।
৩৮. তাফসীর আস-সা'দী (বৈরুত : মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১৪২২ হিঃ), পৃঃ ৮৩১।

অতএব মানব জাতি সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে চাইলে, পরকালে কল্যাণ পেতে চাইলে, দেশে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে কেবল আল্লাহকে ভয় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد 'যারা ভয় করে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং আমার কঠিন শাস্তির ভয় করে' *(ইবরাহীম ১৪/১৪)*। আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة 'তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সাদাক্বাহ করে হলেও'।[৩৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا 'আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুবই কম এবং কাঁদতে খুব বেশী'।[৪০]

**(৯) এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্র নিকট আশা-প্রত্যাশা করা ওয়াজিব :** মহান আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا 'তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে তাদের মধ্যে কে কত নিকটবর্তী হতে পারে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৫৭)*।

উক্ত আয়াতে 'ওয়াসিলা' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, সকল সৎ আমল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা। কোন মৃত ব্যক্তির ওসীলা নয়, পীর বাবার ওসীলা নয়, রাসূল (ছাঃ)-এর ওসীলা নয়, কোন ব্যক্তির যাত সত্তা-সম্মান দ্বারা ওসীলা নয়। কেননা এরূপ ওসীলা কুরআন ও সুন্নাহ এবং সালাফে ছালেহীনের দেখানো পথের বিরোধী কাজ। বরং সকল পাপ কাজ বর্জরে মাধ্যমেই মানব জাতি আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জণ করতে পারবে নচেৎ নয়।[৪১]

ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, এখানে ওসীলার তিনটি অর্থ। (১) আল্লাহ্র আনুগত্য এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা। এটা ফরয। এর দ্বারাই ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ করে থাকে। (২) রাসূল (ছা)-এর দো'আর মাধ্যমে ও তাঁর শাফা'আত দ্বারা ওসীলা। এটা ছিল তাঁর জীবদ্দশায়। আর ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তিনি মানব জাতির জন্য শাফা'আত করবেন। এভাবেই মানব জাতি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করবে। (৩) নবীর যাত সত্তা বা মান-সম্মান দ্বারা ওসীলা করা। এরূপ আমল ছাহাবীগণ করতেন না, তাঁর জীবদ্দশায়ও না এবং তাঁর মৃত্যুর পরও না। তাঁর কবরের নিকট হানীফা (রহঃ) এবং তার সাথীগণ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এরূপ আমল শরী'আতে জায়েয নয়। এরপর তারা এরূপ আমল করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, কোন ব্যক্তি যেন এরূপ না বলে যে, আমি নবীগণের মাধ্যমে তাদের যাত-সত্তা ও সম্মান দ্বারা ওসীলা করছি।[৪২]

অতএব মানব জাতি আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশা হবে না তাঁরই উপর আশা ভরসা করবে, তাঁরই ভয় করবে। আল্লাহ্র ভয়ে অন্যায়-অপকর্ম-পাপ করা থেকে দূরে থাকবে এবং তাঁর রহমত এবং প্রত্যাশায় সকল সৎ আমল করবে তাহলেই আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনে ধন্য হবে এবং ভয়াবহ কঠিন দিনে পরিত্রাণ পাবে।[৪৩] মহান আল্লাহ বলেন, وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 'আল্লাহকে ভয় ভীতি ও আশা-আকাঙ্খার সাথে ডাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রহমত সৎকর্মশীলদের অতি সিন্নকটে' *(আ'রাফ ৭/৫৬)*।

হে মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কোন পাপ করে বসলে সাথে সাথে আল্লাহ্র দিকে রুজূ' হও তথা ইস্তিগফার পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশা হয়ো না। মহান আল্লাহ তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

হে মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে অংশীদারস্থাপন কর না। কারণ শিরকের গুনাহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদারস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করেন না, তবে শিরকের পাপ ব্যতীত অন্য পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন *(নিসা ৪/৪৮)*।

অতএব হে মানব জাতি! যারা কবর-মাযার কেন্দ্রিক ইবাদতকারী আল্লাহ্র জন্য সকল ইবাদত কর, শিরকী কাজ ছেড়ে দাও। নচেৎ পরকাল শুন্য হয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই আসুন! আমরা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও সৎ আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনে ধন্য হই। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِى خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِى عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِى عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ.

'আল্লাহ যেদিন রহমত সৃষ্টি করেন সেদিন একশ' রহমত সৃষ্টি করেছেন। নিরানব্বইটি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন এবং একটি রহমত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি কাফির আল্লাহ্র কাছে সুরক্ষিত রহমত সম্পর্কে জানে তাহলে সে জান্নাত লাভে নিরাশা হবে না। আর মুমিন যদি আল্লাহ্র কাছে যে শাস্তি আছে সে সম্পর্কে জানে তাহলে সে জাহান্নাম থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে না'।[৪৪] জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনছারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে একথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ মৃত্যুবরণ করবে, সে যেন আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা রেখে মৃত্যুবরণ করে'।[৪৫] *(চলবে)*

***[লেখক : এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব]***

৩৯. আহমাদ হা/১৮২৭২; বুখারী হা/১৪১৭; মুসলিম হা/১০১৬।
৪০. বুখারী হা/৪৬২১; মুসলিম হা/২৩৫৯।
৪১. তাফসীর আত-তাবারী ৮/৪০২-৪০৪ পৃঃ।
৪২. ইবনু তাইমিয়া, ক্বায়েদা জালীলা ফী আত তাওয়াসসুল ওয়াল ওসীলা, পৃঃ ৮৩-৮৬।
৪৩. তাফসীর ইবনু কাছীর ৯/৩২-৩৩ পৃঃ।
৪৪. আহমাদ হা/৮৪১৫; বুখারী হা/৬৪৬৯; মুসলিম হা/২৭৫৫।
৪৫. আহমাদ হা/১৪১৫৭; মুসলিহ হা/২৮৭৭।

# ছিটমহল : উন্মুক্ত কারাগার; অতঃপর মুক্তির নিঃশ্বাস

-আকরাম হোসেন

**ভূমিকা :**

কাঁটাতারের কোন বেড়া নেই। খুঁটি কিংবা সীমানা পিলার খুঁজতে চাইলেও লাভ নেই। তারপরও মানুষগুলো চারদিকে থেকে বন্দী। চাইলেই যখন-তখন যেভাবে খুশি বের হওয়ার উপায় নেই। রাস্তা বলতে কোথাও জমির আইল ধরে চলা। আবার জলাভূমি থাকলে তার ওপর তৈরি হয়েছে বাঁশের সাঁকো। ভূমি থাকলেও দেশের ওপর অধিকার নেই। বাংলাদেশ ও ভারতে এ ধরণের ১৬২টি ভূখণ্ড রয়েছে, যার মধ্যে ভারতের ১১১টি ভূখণ্ড বাংলাদেশে। আর বাংলাদেশের ৫১টি ভূখণ্ড রয়েছে ভারতে। ছুটে যাওয়া বলেই এসব ভূখণ্ড 'ছিটমহল' নামে পরিচিত। আর 'ছিটের মানুষ' পরিচিত ছিটমহলের অধিবাসী বলে। মূলভূখণ্ডে থাকা মানুষের তুলনায় ছিটমহলবাসীর জীবনে সুযোগ-সুবিধা কিছু নেই বললেই চলে। উল্টো তাদেরকে কোন নাগরিক পরিচয়পত্রও দেওয়া হয় না, কারণ দুই দেশের রাষ্ট্রনায়করাই তাদের নিয়ে দ্বিধান্বিত যে, ওই মানুষগুলো আসলে কোন্ ভূমির মানুষ। মানুষকে মাপা হয় তাদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় পরিচয়ের মানদণ্ডে। যে কারণে ছিটমহলবাসীর কাছে তার ভূমির তুলনায় মূলভূখণ্ডের ভূমি অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের দীর্ঘদিনের আলোচনার প্রেক্ষিতে দুই দেশই তাদের মধ্যে থাকা ছিটমহল বিনিময় করতে সম্মত হয়। অবশেষে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মানচিত্রে পুনরায় যুক্ত হবে ভূমি ও ভূমি সন্তানরা। এর ফলে ছিটমহলবাসীরা পাবে পূর্ণ স্বাধীনতা।

**ছিটমহল পরিচিতি :**

ছিটমহল হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের কিছু অংশ, যা অন্য একটি বা দু'টি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মাঝে অবস্থিত। যার দখলদারিত্ব অমীমাংসিত। 'ছিটমহল' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'এনক্লেভ' (ENCLAVE)। শব্দটি ইংরেজী কূটনৈতিক শব্দের অভিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৮৬৮ সালে। ফারসী ভাষা থেকে শব্দটি ইংরেজিতে আসে। এনক্লেভ এবং এর সঙ্গে সম্পাদিত কিছু শব্দ আগেই ফরাসী ও স্প্যানিশ ভাষায় ছিল। যার অর্থ ছিল কোন কিছু দিয়ে ঘেরা, অন্তর্ভুক্ত, নির্দিষ্ট ইত্যাদি। এগুলো এসেছিল ল্যাটিন 'Clavus'-এর তিন দশক পর আসে Exclave শব্দটি। EXCLAVE বোঝানো হয় একটি দেশের মাঝে আবদ্ধ থাকলে। আর ENCLAVE ব্যবহৃত হয় দু'টি দেশ দ্বারা ঘেরা থাকলে। যেমন– কালিনইনগ্রাদ রাশিয়ার এনক্লেভ নয়, বরং এক্সক্লেভ। কারণ এটি লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যান্ড দু'টি দেশ দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কিন্তু সাগরের মাধ্যমে সেখানে প্রবেশ করা যায়। সেটিকে ছিটমহল বলা যাবে না। যেমন- পর্তুগাল স্পেনের ছিটমহল নয়, কিংবা গাম্বিয়া সেনেগালের ছিটমহল নয়।

মোটকথা ছিটমহল একটি দেশের সীমান্তবর্তী সেই এলাকা, যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশের নাগরিকদের বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহলের সংখ্যা ১৬২। এই ছিটমহল মানে ভারতের ভিতরে বাংলাদেশের আর বাংলাদেশের ভিতরে ভারতীয় ভূখণ্ড। আবার এমনও আছে, বাংলাদেশের ভিতরে ভারত, তার ভিতরে আবার বাংলাদেশ। যেমন কুড়িগ্রামে ভারতের ছিটমহল দাশিয়ারছড়া। দাশিয়ারছড়ার ভিতরেই আছে চন্দ্রখানা নামের বাংলাদেশের একটি ছিটমহল।

**ছিটমহল সৃষ্টির উৎস :**

জনশ্রুতি আছে, ব্রিটিশ শাসনামলে কোচ রাজা এবং রংপুরের মহারাজারা স্থলসীমান্ত দিয়ে একে অপরেরর রাজ্য থেকে পৃথক ছিল। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমনকি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেও ছিটমহলের বিনিময় হ'ত। ব্রিটিশদের শাসনকালের আগ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী এ ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ও মহারাজারা মিলিত হতেন তিস্তাপাড়ে দাবা ও পাশা খেলার উদ্দেশ্যে। খেলায় বাজি ধরা হ'ত বিভিন্ন মহল নিয়ে, যা কাগজের টুকরা দিয়ে চিহ্নিত করা হ'ত। খেলায় হার-জিতের মধ্য দিয়ে এ কাগজের টুকরা বা ছিট বিনিময় হ'ত। সাথে সাথে বদলে যেত সংশ্লিষ্ট মহলের মালিকানা। এভাবে সে আমলে তৈরি হয়েছিল এক রাজ্যের ভিতর অন্যের ছিটমহল, যা ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাজন পরবর্তীও বহাল থাকে। ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা পেলেও অনেক পরে স্বতন্ত্র রাজ্য কুচবিহারের মহারাজা নারায়ণ ভুপ বাহাদুর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ইউনিয়নে যুক্ত হন। কুচবিহার রাজ্যের কোচ রাজার জমিদারির কিছু অংশ রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন থানা পঞ্চগড়, ডিমলা, দেবীগঞ্জ, পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট, ফুলবাড়ী ও ভুরুঙ্গামারিতে অবস্থিত ছিল। ভারত ভাগের পর ঐ আট থানা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এদিকে কুচবিহার একীভূত হয় পশ্চিমবঙ্গের সাথে। ফলে ভারতের কিছু ভূখণ্ড আসে বাংলাদেশের কাছে। আর বাংলাদেশের কিছু ভূখণ্ড যায় ভারতে। এই ভূমিগুলোই ছিল ছিটমহল।

**সীমানা নির্ধারণের সমস্যা :**

১৯৪৭ সালে বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমারেখা টানার পরিকল্পনা করেন লর্ড মাউন্টবেটেন। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ আইনজীবী সিরিল রেডক্লিফকে প্রধান করে সে বছরই গঠন করা হয় 'সীমানা নির্ধারণের কমিশন'। ১৯৪৭ সালের ৮ জুলাই লন্ডন থেকে ভারতে আসেন রেডক্লিফ। মাত্র ছয় সপ্তাহের মাথায় ১৩ আগস্ট তিনি সীমানা নির্ধারণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন। এর তিনদিন পর ১৬ আগস্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় সীমানার মানচিত্র। কোনরকম সুবিবেচনা ছাড়াই হুট করে এ ধরণের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি যথাযথভাবে হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, কমিশন সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা আর জমিদার, নবাব, স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও চা-বাগানের মালিকরা নিজেদের স্বার্থে দেশভাগের সীমারেখা নির্ধারণে প্রভাব ফেলেছে। আর উত্তরাধিকার সূত্রই উপমহাদেশের বিভক্তির পর এই সমস্যা বয়ে বেড়াচ্ছে দুই দেশ। ১৯৫৮ সালের নেহেরু-নুন চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ীর উত্তর দিকের অর্ধেকাংশ ভারত এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধেকাংশ ও এর সংলগ্ন এলাকা পাবে পূর্ব পাকিস্তান। চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ীর সীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ভারতের অসহযোগিতায় তা মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে বেরুবাড়ীর দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশ ও এর ছিটমহলের ব্যাপারটি কোন সুরাহা হয়নি।

**স্বাধীনতা পরবর্তী সীমান্ত বিরোধ ও নিরসন :**

স্থলসীমান্ত বিরোধ এবং সমস্যা নিরসনের চেষ্টা ১৯৪৭ সাল তথা দেশ বিভাগের সময় থেকেই হয়ে আসছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিটমহল ও অন্যান্য সীমান্ত বিরোধ

নিরসনে আশার সঞ্চার করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি করেন। এই চুক্তির ১২ ধারায় বলা হয়, 'বাংরাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল ও ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশী ছিটমহল দ্রুততার সঙ্গে বিনিময় হবে'। যদি এই চুক্তি তখনই অনুসরণ করা হ'ত, তাহ'লে সে বছরই ছিটমহল সমস্যা দূর হ'ত। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশ শাসন করেছেন, রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদ দেশ শাসন করেছেন, তারপর বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় ছিলেন। এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম দফায় ক্ষমতা থাকাকালীন পর্যন্ত ছিটমহল সমস্যা সমাধানে কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল ভীষণ কম। প্রায় সবাই কমবেশী আঙ্গুরপোতা-দহগ্রাম সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু ১৬২টি ছিটমহল নিয়ে কেউই সোচ্চার ছিলেন না। তবে শেখ হাসিনা যখন দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতাসীন হলেন, তখন তিনি তিনবিঘা করিডোর এবং ১৬২টি ছিটমহল সমস্যা নিয়ে বেশ তৎপর হন। অবশ্য প্রথমবার ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি তিনবিঘা করিডোরের সাময়িক ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসহযোগিতার কারণে ২০১১ সালে এই ছিটমহল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়নি।

তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ২০১১ সালে ১৯৭৪ সালের চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ঢাকায় এসেছিলেন। আসার কথা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। কিন্তু তিনি আসেননি। তখন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং শুধু প্রটোকল স্বাক্ষর করে চলে যান।

ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোন বাধাই ছিল না। কখনো জিয়া, কখনো এরশাদ, কখনো খালেদা জিয়া ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁরা জোরালোভাবে সমস্যা সমাধানে তৎপর না হ'লেও ছিটমহল বিনিময়ের ইস্যুতে কারো কোন আপত্তি ছিল না। বাধা ছিল শুধু ভারতের। কখনো ফরোয়ার্ড ব্লক, কখনো বামফ্রন্ট এই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গের চারবার নির্বাচিত এমএলএ দীপক সেনগুপ্ত ছিটমহলবাসীর সমস্যা সমাধানে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেন। রাজনৈতিক সংগঠনের ছত্রছায়ায় সম্ভব নয় মনে করে সামাজিকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ২০০৯ সালে তিনি প্রয়াত হ'লে তাঁর ছেলে দীপ্তিমান সেনগুপ্ত আন্দোলনে সক্রিয় হন। একদিকে ছিটমহলবাসীর মুক্তির জন্য নিয়মিত কর্মসূচী গ্রহণ, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি পরিবর্তনের জন্য সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চপদস্থদের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করেন দীপ্তিমান সেনগুপ্ত।

১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতির পরিবর্তন, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিকতা এবং শেখ হাসিনার জোর প্রচেষ্টা ছিটমহল বিনিময়ে প্রধান ভূমিকা পালন করে। গত ৭ মে নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক লোকসভায় ১৯৭৪ সালের স্থলসীমান্ত চুক্তি অনুমোদনের পর খুবই দ্রুত চলতে থাকে বাস্তবায়নের কাজ। অতঃপর ৬ জুন মাত্র একমাস পরেই ঢাকায় শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদি ২০১১ সালে স্বাক্ষরিত প্রটোকল অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি চূড়ান্ত করেন। ৬-১৬ জুলাই পর্যন্ত চলে ছিটমহলবাসীকে কোন্ দেশে থাকতে চায়, সেই পরিসংখ্যানের কাজ। সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ১১১টি ছিটমহল থেকে ৯৭৯ ভারতীয় নাগরিক নিজ দেশে যাবেন। বাংলাদেশী ছিটমহলের একজনও বাংলাদেশে ফিরবেন না। অবশেষে ৩১ জুলাই রাত ১২টার পর ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে ৬৮ বছরের ছিটমহলবাসীর উন্মুক্ত কারাগার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

**একনযরে ১৬২টি ছিটমহল :**

ঘড়ির কাঁটা (৩১শে জুলাই) যখন রাত ১২টা স্পর্শ করে, তখন ভারত ও বাংলাদেশের ১৬২টি ছিটমহলে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। সেই সঙ্গে বদলে যায় বাংলাদেশ ও ভারতের মানচিত্র। এসব ছিটমহলের বাসিন্দাদের দীর্ঘ ৬৮ বছরের বন্দি মানবেতর জীবনেরও অবসান ঘটে। পরের দিন সকালে তারা মুক্ত স্বাধীন দেশের সূর্যোদয় দেখতে পায়। এই ১৬২টি ছিটমহলের ১১১টি এখন বাংলাদেশের। বাকি ৫১টি ভারতের। এসব ছিটে আজ উড়ছে নিজ নিজ দেশের জাতীয় পতাকা। নিম্নে দুই দেশের ছিটমহলের তালিকা তুলে ধরা হ'ল :

**(ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল, যা বর্তমানে বাংলাদেশের :**

❖ পঞ্চগড় যেলার সদর, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপযেলার ভিতরে ছিটমহল রয়েছে ৩৬টি। এগুলো হ'ল : জেএল ৭৫ নম্বর গারাতি, ৭৬ নম্বর গারাতি, ৭৭ নম্বর গারাতি, ৭৮ নম্বর গারাতি, ৭৯ নম্বর গারাতি, ৮০ নম্বর গারাতি, ৭৩ নম্বর সিঙ্গিমারী (অংশ-১), ৬০ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৫৮ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৫৭ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৫৯ নম্বর পুটিমারী, ৫৬ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৫৪ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৫৩ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৫২ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৫১ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৫০ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৪২ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৪৯ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৫৫ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৪৮ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৪৬ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৪৭ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৪৫ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৪৪ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৪১ নম্বর নাজিরগঞ্জ, ৩৮ নম্বর দইখাতা, ৩৭ নম্বর শালবাড়ী, ৩৬ নম্বর কাজলদীঘি, ৩২ নম্বর নাটকটোকা, ৩৩ নম্বর নাটকটোকা, ৩৪ নম্বর বেহুলাডাঙ্গা (২ টুকরো), ৩৫ নম্বর বেহুলাডাঙ্গা, ৩ নম্বর বালাপাড়া খাগড়াবাড়ী, ২ নম্বর কোটভাজনী (৪ টুকরো) ও ১ নম্বর দহলা খাগড়াবাড়ী (৬ টুকরো)।

❖ নীলফামারী যেলার ডিমলা উপযেলার অভ্যন্তরে রয়েছে ৪টি ছিটমহল। এগুলো হ'ল : জেএল ২৮ নম্বর বড় খানকিবাড়ী, ২৯ নম্বর বড় খানকি খারিজা গিদালদহ, ৩০ নম্বর বড় খানকি খারিজা গিদালদহ ও ৩১ নম্বর নগর জিগাবাড়ী।

❖ লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম ও হাতীবান্ধা উপযেলার অভ্যন্তরে রয়েছে ৫৯টি ছিটমহল। এগুলো হ'ল : জেএল ১৫৩/পি নম্বর পানিশালা, ১৫৩/ও নম্বর পানিশালা, ১৮ নম্বর দিশারী খামারি খুশবুস, ১৯ নম্বর পানিশালা, ১৭ নম্বর পানিশালা, ১৭/৫ নম্বর কামাত চেংড়াবান্ধা, ১৬ নম্বর বোটবাড়ী, ১৬/এ কামাত চেংড়াবান্ধা, ২১ নম্বর পানিশালা, ২০ নম্বর লতামারী, ২২ নম্বর লতামারী, ২৫ নম্বর ডারিকামারি, ২৩ নম্বর ডারিকামারি, ১৪ নম্বর লতামারী, ১০ নম্বর খরখরিয়া, ১৪ নম্বর খরখরিয়া, ১০১ নম্বর ফুলকারবাড়ী, ১২ নম্বর বাগডাকিয়া, ১১ নম্বর রতনপুর, ৭ নম্বর উপেন চৌকি কুচলিবাড়ী, ১১৫/২ উপেন চৌকি কুচলিবাড়ী, ৬ নম্বর জামালদহ বালাপুকুরি, ৫ নম্বর বালাপুকুরি, ৪ নম্বর বালাখাঙ্গির, ৮ নম্বর ভোটবাড়ী, ৯ নম্বর বড়খাঙ্গির, ১০ নম্বর বাগডাকিয়া, ২৪ নম্বর ভোটহাট, ১৩১ নম্বর বাঁশকাটা, ১৩০ নম্বর বাঁশকাটা, ১৩২ নম্বর বাঁশকাটা, ১৩৩ নম্বর ভোয়ারামগুড়ি, ৩৮/৩৯ কুচবিহারের একটি ছিট, ১৩৪ নম্বর চেনাকাটা, ১১৯ নম্বর বাঁশকাটা, ১২৮ নম্বর বাঁশকাটা, ১১৭ নম্বর বাঁশকাটা, ১১৮ নম্বর বাঁশকাটা, ১১৬ নম্বর বাঁশকাটা, ১২৩ নম্বর বাঁশকাটা, ১২৪ নম্বর বাঁশকাটা, ১২৫ নম্বর বাঁশকাটা, ১২৯ নম্বর

বাঁশকাটা, ১২৬ নম্বর বাঁশকাটা, ১২৭ নম্বর বাঁশকাটা, ১২০ নম্বর বাঁশকাটা, ১২১ নম্বর বাঁশকাটা, ১১৩ নম্বর বাঁশকাটা, ১১২ নম্বর বাঁশকাটা, ১১৪ নম্বর বাঁশকাটা, ১১৫ নম্বর বাঁশকাটা, ১২২ নম্বর বাঁশকাটা, ১০৭ নম্বর বড় কুচলিবাড়ী, ২৬ নম্বর কুচলিবাড়ী, ২৭ নম্বর কুচলিবাড়ী ১৩৫ নম্বর গোতামারী, ১৩৬ নম্বর গোতামারী, ১৫১ নম্বর বাঁশপচাই ও ১৫২ নম্বর ভিতরকুটি।

❖ কুড়িগ্রাম সদর, ফুলবাড়ী, ও ভুরুঙ্গামারী উপযেলার অভ্যন্তরে ছিটমহল রয়েছে ১২টি। এগুলো হ'ল : জেএল ১৫০ নম্বর দাশিয়ারছড়া, ১৪৯ নম্বর ছোট গাড়োলঝড়া পিটি ১১, ১৪৮ নম্বর ছোট গাড়োলঝড়া পিটি ১, ১৪৪ নম্বর দীঘলটারি, ১৪৫ নম্বর দীঘলটারি, ১৪৬ নম্বর গাওচুলকা, ১৪৭ নম্বর গাওচুলকা, ১৪৩ নম্বর বড় গাওচুলকা, ১৪২ নম্বর সেউতি কুর্শা, ১৫৩ নম্বর সাহেবগঞ্জ, ১৪১ নম্বর ছিট কালামাটি ও ১৫৬ নম্বর ডাকুরহাটি ডাকিনিরকুটি।

**(খ) ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল, যা বর্তমানে ভারতের :**

ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম যেলার অধীনে ৫১টি ছিটমহল রয়েছে। যা ভারতের কুচবিহর যেলায় ৪৭টি এবং অবশিষ্ট ৪টি জলপাইগুড়ি যেলায় অবস্থিত। এগুলো হ'ল : জেএল ২২ নম্বর কুচলিবাড়ী, ২৪ নম্বর কুচলিবাড়ী, ২১ নম্বর বালাপুকুরি, ২০ নম্বর পানবাড়ী, ১৮ নম্বর পানবাড়ী, ২১ নম্বর বামনজল, ১৪ নম্বর ধবলশুতি, ১৫ নম্বর ধবলশুতি মৃগিপুর, ১৪ নম্বর ধবলসুতি, ৩৫ নম্বর ল্যান্ড অব জগৎবেড়-১, ৩৬ নম্বর ল্যান্ড অব জগৎবেড়-২, ৩ নম্বর জোত নিজ্জামা, ৩৭ নম্বর জগৎবেড়, ৮ নম্বর শ্রীরামপুর, ৪৭ নম্বর কোকোবাড়ী, ৬৭ নম্বর ভান্দেরদেহ, ৫২ নম্বর ধবলগুড়ি, ৭২ নম্বর ধবলগুড়ি (নং-৫), ৭১ নম্বর ল্যান্ড অব ধবলগুড়ি, ৩২ নম্বর ধবলগুড়ি, ৭০ নম্বর ল্যান্ড অব ধবলগুড়ি-৩, ৬৮ নম্বর ল্যান্ড অব ধবলগুড়ি, ৬৯ নম্বর ল্যান্ড অব ধবলগুড়ি, ৫৪ নম্বর মহিষমারী, ৬৪ নম্বর ফলনাপুর, ৬৫ নম্বর (৩ টুকরো) নলগ্রাম নম্বর-১, ৬৬ নম্বর (২ টুকরো) নলগ্রাম, ১৩ নম্বর শ্রাধুবল, ৫৭ নম্বর আমজল, ৮২ নম্বর কিসামত বাত্রিগাছ, ৮১ নম্বর (২ টুকরো) বাত্রিগাছ, ৮৩ নম্বর দুর্গাপুর, ১ নম্বর বনসুয়া খামার গিদালদহ, ৮ নম্বর কিসামত বাত্রিগাছ, ৮ নম্বর শিবপ্রসাদ মোস্তাফি, ৯ নম্বর (৩ টুকরো) করলা, ১৪ নম্বর (৩ টুকরো) উত্তর ধলডাঙ্গা, ১ নম্বর উত্তর বাঁশজানি, ২ নম্বর উত্তর মশালডাঙ্গা, ১১ নম্বর পূর্ব মশালডাঙ্গা, ৩ নম্বর (৬ টুকরো) মধ্য মশালডাঙ্গা, ৬ নম্বর (৬ টুকরো) দক্ষিণ মশালডাঙ্গা, ৫ নম্বর কচুয়া, ৪ নম্বর (২ টুকরো) পশ্চিম মশালডাঙ্গা, ৭ নম্বর পশ্চিম মশালডাঙ্গা, ৮ নম্বর মধ্য মশালডাঙ্গা, ১০ নম্বর (২ টুকরো) পূর্ব মশালডাঙ্গা, ৩০ নম্বর মধ্য বাকালিরচড়া, ৩৮ নম্বর পশ্চিম বাকালিরছড়া ও ৩৭ নম্বর পাথরডুবি।

**দুর্দশাগ্রস্ত ও সংকটময় জীবনের অবসান :**

দীর্ঘ ৬৮ বছর ছিটমহলবাসীর জীবন ছিল গভীর অন্ধকারে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ১১১টি ছিটমহলের মধ্যে ৪২টিতে এবং ভারতের অভ্যন্তরে থাকা বাংলাদেশী ছিটমহলগুলোর ১৬টিতে কোনো মানুষের বাস নেই। বাকি ছিটমহলগুলোর দেশীয় পরিচয়ের চেয়ে বড় পরিচয় ছিল তারা ছিটের মানুষ। প্রকৃতার্থে তাদের কোন সরকার ছিল না। তাদের স্কুল ছিল না, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল না, যোগাযোগ ব্যবস্থার কোনো উন্নয়ন হয়নি এবং বৈদ্যুতিক সুবিধা বঞ্চিত ছিল। ছিটমহলের মানুষ মেয়ের বিয়ে দিত অন্য একজনের বাবা পরিচয়ে। স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে হ'লে অন্য একজনকে স্বামী পরিচয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হ'ত। সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করাতে হলে মিথ্যা ঠিকানা ব্যবহার করতে হ'ত। কেউ জমি দখল করলেও কিছুই করার ছিল না। কোন অপরাধের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা ছিল না। সংখ্যালঘু হওয়ায় তাদের সব অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোতে বহুবার অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। লুটপাট চলেছে সব সময়। ছিটের বাইরে বের হ'লেই বিএসএফ এসে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে ধরে নিয়ে গেছে। অভিযোগ আছে, পর্যাপ্ত ঘুষ দিতে না পারলে তাদের জেলে দেওয়া হ'ত। জেল জীবন শেষ হ'লে তাদের ছেড়ে দেওয়া হ'ত বাংলাদেশী কোন বর্ডারে। বাংলাদেশী ছিটমহলবাসীকে শুধু শারীরিক-মানসিক নির্যাতন নয়, অনেককে মেরেও ফেলেছে। কিন্তু কোনো বিচার হয়নি। ছিটমহলের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও তারা সেখানে পড়ালেখা করতে পারেনি।

অবশেষে বহু কাঙ্খিত ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে দীর্ঘ ৬৮ বছর পর তাদের ওপর আচ্ছন্ন অন্ধকার দূর হয়ে আলোর মুখ দেখতে পাচ্ছে ছিটমহলবাসী। এখন তারা সরকার পাবে, নিজের পরিচয় পাবে, স্বাধীন ভূখণ্ড পাবে, শিক্ষা-চিকিৎসা সেবা পাবে, অপবাদ থাকবে না, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, বিদ্যুৎ পাবে। সীমানাবিহীন প্রাচীর থাকবে না, মিথ্যার বেসাতি সাজাতে হবে না। শোষণ-নির্যাতন-বঞ্চনা-নিগ্রহ-নিষ্পেষণ-অবহেলা-উপেক্ষা-নাগরিকত্বহীনতা সবকিছুরই অবসান হচ্ছে ১ আগস্ট থেকে। ফলে তারা বুকভরা শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন ভূখণ্ডে। যেন শান্তিময় মুক্তির নিঃশ্বাস, যার জন্য তারা ৬৮ বছর সংগ্রাম করে আসছে।

**ছিটমহল বিনিময়ে লাভ-ক্ষতির খতিয়ান :**

স্থলসীমান্ত চুক্তির একটি বড় অংশই হ'ল ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল বিনিময়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল 'তৃণমূল কংগ্রেসে'র পক্ষ থেকে নিজেদের জমি হারানোর ক্ষতিকে বড় হিসাবে দেখেই মূলতঃ বিরোধিত করা হচ্ছিল। ভারতের লোকসভায় ছিটমহল বিনিময়, অপদখলীয় ভূমি হস্তান্তর এবং অচিহ্নিত স্থলসীমানা চিহ্নিতকরণবিষয়ক চুক্তিটি অনুমোদিত হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ১৭ হাযার ১৫৮ একর ভূমিসংবলিত ১১১টি ভারতীয় ছিটমহলের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একইভাবে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ৭ হাযার ১১০ একর ভূমিসংবলিত ৫১টি বাংলাদেশের ছিটমহলের ওপর ভারতের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতের ১১১টি ছিটমহলে সর্বশেষ শুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা হ'ল ৩৭ হাযার ৩৬৯ জন। ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের জনসংখ্যা হ'ল ১৪ হাযার ২১৫ জন। চুক্তি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ১০ হাযার ৪৮ একর জমি বেশী পাচ্ছে। ছিটমহল বিনিময় পূর্বে পরস্পরের ছিটমহল উভয় দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ার কারণে উভয় দেশের ছিটমহলের ওপর উভয়ের প্রতীকী দখল ছিল। সুতরাং চুক্তিটি কার্যকর হওয়ায় উভয় দেশের পারস্পরিক ছিটমহলস্থ ভূমির ওপর উভয় দেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এ চুক্তিটির আওতায় অপদখলীয় ভূমিরও হস্তান্তর করা হবে। অপদখলীয় ভূমি হচ্ছে বাংলাদেশের আইনসম্মত ভূমি, যা ভারতের দখলে রয়েছে। অনুরূপ বাংলাদেশের দখলে থাকা ভরতের আইনসম্মত ভূমি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম ও ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার অনেক স্থানে দুই দেশের বাসিন্দারা সীমান্ত রেখা ছাড়িয়ে গিয়ে ভূমি দখল করে রেখেছে বছরের পর বছর। এসব বিরোধপূর্ণ ভূমি যাদের দখলে আছে, তারা সে স্থানে কৃষিকাজও করছে। চুক্তিটি কার্যকর হওয়ায় এসব ভূমি বহু বছর ধরে যাদের অপদখলে ছিল, তাদের ভূমি দখল ছেড়ে দিতে হবে। এর ফলে ভারতের দখলে যাবে অপদখলীয় ভূমির

২ হাযার ৭৭৭ একর এবং বাংলাদেশের দখলে আসবে অপদখলীয় ভূমির ২ হাযার ২৬৭ একর। রেডক্লিফ যেভাবে সীমানা চিহ্নিত করেছিলেন, অপদখলীয় ভূমি বিনিময়ের ফলে সে সীমানা রেখার কিছুটা হেরফের হবে। আর তাই প্রকৃতই এগুলো অপদখলীয় ভূমি কি-ন, সে বিষয়ে অনেকের সংশয় রয়েছে। অপদখলীয় ভূমি বিনিময়ের কারণে বাংলাদেশ অতিরিক্ত ৫১০ একর ভূমির ওপর দখল হারাবে।

ছিটমহল বিনিময়ে আপতদৃষ্টিতে জমির পরিমাপের দিক থেকে বাংলাদেশই লাভবান হচ্ছে। এটা ঠিক। তবে পৃথক একটি সূত্র জানায়, এতে ভারতের লাভও আছে। জমি, আর্থিক ক্ষতি ও শরণার্থী সমস্যার জন্য ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার অমীমাংসিত ছিটমহল বিনিময় নিয়ে ভারতের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ও পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সহ কিছু সংস্থা এতদিন বিরোধিতা করছিল। কারণ ছিটমহল বিনিময় হলে বাংলাদেশের দিক থেকে ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবেন। যাদের আর্থিক দায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিতে পারবে না। এছাড়া ভারতের হাতে জমির পরিমাণও কমে যাবে। আর বাংলাদেশ জমি বেশি পাবে। এ প্রসঙ্গে 'ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি'র শীর্ষনেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বলেন, আমরা জরিপ করে দেখেছি বিনিময় হ'লে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার, যাদের বসবাসের জমিটুকুও নেই তারাই ভারতে আসতে চাইছেন। বাকি প্রায় সবাই বাংলাদেশেই থাকতে চান। আর ভারতের অংশের কেউই বাংলাদেশে যেতে চান না। এদিকে চলে আসা মানুষের পুনর্বাসনের জন্য আমরাই জমির বন্দোবস্ত করেছি। তাদের উন্নয়নের বিষয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি এনজিও আমাদের সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন নেই'।

জমি পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ জমি বেশি পাবে এটা ঠিক। কিন্তু এর পাশাপাশি এপারের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দখলে আসবে কার্যকরি জমি। হিসাব করে দেখানো যায়, বিনিময় হ'লে প্রতিবছর আর্থিকভাবে লাভবান হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যার টাকার পরিমাণ প্রায় ২৫ কোটি টাকা'। দীপ্তিমান বলেন, 'বাংলাদেশী ছিটমহলের জমি তিন ফসলি, যার বার্ষিক খাজনার পরিমাণ হবে ৬ লাখ টাকা। ভারতের এই অঞ্চলে গড়ে বছরে জমি ক্রয়-বিক্রয় হয় প্রায় ৬ শতাংশ হারে। যার বিঘা প্রতি ১ লাখ টাকা দাম হ'লে সরকারী স্ট্যাম্প ডিউটি হয় দেড় কোটি টাকা। এই অঞ্চলে কৃষিজ পণ্য মূলতঃ পাট ও তামাক উৎপাদন হয় বছরে দেড়শ কোটি টাকা। এর থেকে বিক্রয় কর ২ শতাংশ হারে হ'লে বছরে পাওয়া যাবে ৩ কোটি টাকা। এছাড়া জমির বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধি জিডিপি অনুসারে প্রায় ৬-৮ শতাংশ। সরকারের হাতে থাকা খাস জমি লিজ দিলে বিভিন্ন প্রকল্পে সেখানেও বছরে বেশ কয়েক কোটি টাকার সরকারের রাজস্ব আসবে স্বাভাবিকভাবেই। এতে দেখা যাচ্ছে ভারতেরও খুব একটা ক্ষতি হবে না।

উপরিউক্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, চুক্তিটির মাধ্যমে একটি দেশের ভূমি অধিক বা কম প্রাপ্তি দেশটির লাভ-ক্ষতির বিষয় নয়। আসল কথা হ'ল, লাভ-ক্ষতির আলোকে চুক্তিটি না দেখে দেখতে হবে এটি পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করাসহ গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় কতটুকু সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এটি কার্যকর হওয়ায় আশা করা যায়, আমাদের উভয় দেশের সীমান্তে যেকোন ধরণের উত্তেজনার প্রশমন হবে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থিতিশীল থাকবে এবং উভয় দেশ পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল থাকবে।

**সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ :**

দীর্ঘ ৬৮ বছর ঝুলে থাকা একটি গুরুত্ববহ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হ'ল দু'দেশের মধ্যে বহুল আলোচিত-প্রত্যাশিত ছিটমহল বিনিময় দ্বারা। এজন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ সরকারকে, সাথে সাথে ভারত সরকারকেও। এখন বিনিময়ের কারণে ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশের অংশ এবং বাংলাদেশী ছিটমহল ভারতের অংশ। ইতিমধ্যে ভারত ছিটমহলগুলোর উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশকেও ছিটমহলগুলোর উন্নয়নে অনুরূপ কর্মসূচী নিতে হবে। স্থানীয় সরকারের অফিসাদি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে হবে। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নাগরিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যেহেতু ছিটমহলগুলো তুলনামূলকভাবে অবনত, সেহেতু সেখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিক বরাদ্দ ও নযর নিয়োজিত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, যোগাযোগ, পচিয়পত্র, বিদ্যুৎ এসবের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যারা মিথ্যা ঠিকানা ব্যবহার করে লেখাপড়া করেছে, তাদের জন্য চাকরির শর্ত শিথিল করে চাকরির ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। একটি বিষয় পর্যবেক্ষকদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। সেটা হ'ল, ভারতের অভ্যন্তরস্থ বাংলাদেশের ছিটমহলের একজনও বাংলাদেশে আসার বা বাংলাদেশী নাগরিত্ব নেওয়ার আগ্রহ দেখায়নি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ ভারতের ছিটমহলের কয়েকশ' লোক ভারতের নাগরিত্ব নিতে দেখা গেছে। এরকম একটি ঘটনা কেন ঘটল, সেটা অবশ্যই খতিয়ে দেখার বিষয়। এটা গবেষকদের ও সরকারের বিবেচনায় আনতে হবে। ছিটমহলগুলোতে সর্বত্র আস্থা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে, যাতে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের ছিটমহলবাসীরা এগিয়ে যেতে পারে, এগিয়ে থাকতে পারে। এদিকেও বিশেষ নজর রাখতে হবে ছিটমহলবাসীর সীমাহীন আনন্দের বন্যায় যেন কালো দাগ না পড়ে। তাদের নিয়ে যেন আর নতুন করে কেউ কোনো নোংরা রাজনীতির বলয় নির্মাণ করতে না পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিকট যথাযথ ও কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

**উপসংহার :**

বাংলাদেশ-ভারত মানচিত্র থেকে মুছে গেল ছিটমহল। রক্তপাতহীন শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবেশী দু'টি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বিনিময় ও এত বিপুল সংখ্যক মানুষের নাগরিকত্ব বদল বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। এতে উভয় দেশের ছিটমহলবাসীরা পেল পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ। তবে বাংলাদেশী ছিটমহলবাসীদের জন্য আনন্দের মাত্রা একটু বেশিই হবে। কেননা এটি তদের তৃতীয়বার এবং চূড়ান্ত স্বাধীনতা। যদি কোন ভূখণ্ডের মানুষ তিনবার স্বাধীনতা পায় তাকে ঐতিহাসিক, অবিশ্বাস্য বা ব্যতিক্রমই বলতে হবে! যদিও প্রথম দুই স্বাধীনতা তাদের কোন উপকারে আসেনি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ ও ১৯৭১-এ স্বাধীনতা। অবশেষে গত ১ আগস্ট ছিল তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ! আমরা ছিটমহলবাসী সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। তাদের সার্বিক উন্নয়ন, মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ছিটমহলবাসীর জীবনের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

*[লেখক : চতুর্থ বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]*

# সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি : হিরোশিমা নাগাসাকিতে রক্তাক্ত ট্র্যাজেডী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম

**ভূমিকা :**

উদযাপিত হ'ল হিরোশিমা-নাগাসাকির ৭০ তম বার্ষিকী। ৭০ বছর পর পৃথিবীবাসী স্মরণ করছে জাপানের দু'টি শহরের বীভৎস চেহারা ও বিভীষিকাময় দুঃখজনক স্মৃতি। প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের নৃশংতায় জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকির শহর দু'টি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কয়েক লক্ষ অসহায় বনী আদম মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মানব বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় তথাকথিত মানব সভ্যতার পাদপীঠ জাপান। এর জন্য মারণাস্ত্রই মূলতঃ দায়ী। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, হিংস্র মানসিকতা, কুচক্রী ইহুদী বিজ্ঞানীর উৎসাহী ভাবনা এবং আইনস্টাইনের কুপরামর্শে তৈরী হয় মারণাস্ত্র। পারমানবিক অস্ত্র প্রথম পরীক্ষার সময় বিজ্ঞানীগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন আবিষ্কারকরা, কেউ ছিল স্তব্ধ-বাকশূন্য, কেউ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে চোখের পানি ফেলেছিলেন। কেউবা আবার হট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। তারপরেও শুধুমাত্র আধিপত্য বিস্তার ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অজুহাতে আমেরিকা ইতিহাসের এক বর্বরোচিত ও জঘন্য হামলা পরিচালনা করে। আজও তার স্মৃতি বহন করছে হিরোশিমা ও নাগাসাকিবাসী। এই অধিবাসীর মায়েরা সর্বদা আতঙ্কে দিনাতিপাত করে তার শিশু সন্তান সুস্থভাবে জন্ম নিবে কি-না। কিংবা তারা এই পৃথিবীতে বেশীদিন টিকবে কি-না? কারণ পারমানবিক তেজস্ক্রিয়া এত তীক্ষ্ণ ও ভয়াবহ যে, মানব দেহকে বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু করে দেয়। এমনকি মরণব্যাধি ক্যান্সারেও পরিণত হয়। ৭০ বছর ধরে জাপানীরা সহ সারা বিশ্ব আকুল আবেদন করছে 'পারমানবিক বোমা মুক্ত' বিশ্ব গড়ার। কিন্তু এই বঞ্চিত মানবতার বুকফাটা করুণ আর্তনাদ শ্রবণ করার কেউ নেই। সবাই ব্যস্ত নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে। নিজের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যবাদী চেতনা অব্যাহত রাখতে। ফলে বিশ্ব এখন মারণাস্ত্র মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে সর্বাধিক মারণাস্ত্রের ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। ফলে 'স্নায়ু যুদ্ধ' বা (Cold war) নামের বিশ্ব যুদ্ধের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তাই অকপটচিত্তে স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের এই যুগে পৃথিবীবাসী নিজেদের ধ্বংসের মারণাস্ত্রই অর্জন করেছে মাত্র, নৈতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সক্ষমতা অর্জন করেনি।

**জাপানের পারমানবিক বোমার প্রেক্ষাপট ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ :**

১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ই আগস্ট মানবতা হত্যা ও ধ্বংসের পিছনে যে প্রেক্ষাপট কাজ করে, তাহ'ল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। জার্মানীর একনায়ক হিটলারের বিশ্বশাসনের অমূলক, অবাস্তব ও অসম্ভব খায়েশ দিয়ে শুরু এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতালিপ্সার জন্যই হিরোশিমা ও নাগাসাকি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয় হিটলারের ন্যাৎসী বাহিনীর পোলাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ১৯৩৯ সালের পহেলা সেপ্টেম্বরে জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করে। প্রতিউত্তরে মিত্রবাহিনী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৩রা সেপ্টম্বর। অবশেষে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মানবতার লজ্জার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ সমাপ্ত করে। এ যুদ্ধে পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো এবং অন্যান্য ছোট-বড় রাষ্ট্রগুলো দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে জার্মান নেতৃত্বে 'অক্ষশক্তি' এবং অন্যদিকে আমেরিকার নেতৃত্বে 'মিত্রশক্তি'।

অক্ষশক্তির প্রধান তিনটি রাষ্ট্র হ'ল জার্মান, ইতালী ও জাপান। মিত্রশক্তির প্রধান রাষ্ট্রগুলো হ'ল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও পোলাণ্ড। আমেরিকা প্রথমে মিত্রশক্তিতে যোগ দেয়নি। কিন্তু ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে এবং আকস্মিকভাবে পার্ল হারবার আক্রমণ করে। পার্ল হারবারে ছিল আমেরিকার নৌ ও বিমান ঘাটি। এ আক্রমণে ২৪০২ জন আমেরিকান নিহত হয় এবং ১২৮২ জন আহত হয়। যার ফলে ১৯৪১ সালে ৮ই ডিসেম্বর আমেরিকা মিত্র শক্তিতে যোগ দেয় এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১১ ডিসেম্বর জার্মানী ও ইতালী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অক্ষশক্তিকে থামানোর জন্য প্রয়োজন ছিল একটি মারণাস্ত্র আবিষ্কারের। আমেরিকা সেই মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তার মধ্যেই অক্ষ শক্তিগুলোর পরাজয় সুনিশ্চিত এবং আত্মসমর্পণ করে অনেকেই। এমতাবস্থায় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমানবিক হামলা চালিয়ে আমেরিকা তার নিজস্ব সর্বোচ্চ সামরিক ক্ষমতা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বে অন্যতম প্রধান সামরিক সুপার পাওয়ার রাষ্ট্র হিসাবে। মিত্রশক্তি হিসাবে সোভিয়েত রেড আর্মী ও চীনারা যে দখলদারিত্ব শুরু করেছিল, পারমানবিক হামলার মাধ্যমে তাদের দখলদারিত্বের রথযাত্রা থামাতে বাধ্য হয়। অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তিগুলো আমেরিকার একনায়কতান্ত্রিক ও একচেটিয়া আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে ইউরোপের অন্যান্য ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পারমানবিক প্রযুক্তি অর্জনে ব্যাপক আকারে বিনিয়োগ করে এবং পারমানবিক সক্ষমতা অর্জন করে। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব আবার প্রবেশ করে স্নায়ু যুদ্ধ (Cold war) নামক নতুন এক যুগে। বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যা ১৯৩৯ সালে হ'তে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ছয় বছর স্থায়ী ছিল এবং এ যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ১ কোটি মানুষ নিহত হয়। আহত হয় প্রায় ৩ কোটি, যার ৮০% ছিল সাধারণ নিরীহ মানুষ।

**হিরোশিমা ও নাগাসাকির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও ৯ আগস্ট নাগাসাকি নগরীতে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করে যুক্তরাষ্ট্র। ১৫ শতকে হিরোশিমা ছিল একটি জরাজীর্ণ গ্রাম। ১৬ শতকে মরিক্লান হিরোশিমায় একটি মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে উন্নয়নের বীজ বপন করেন। তখন থেকেই মূলতঃ হিরোশিমা শহরটি ছিল জাপানের চুগকু-শিককু যেলার সবচেয়ে বড় মন্দিরের শহর। দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সমৃদ্ধ হিরোশিমা বোমার আঘাতে বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। ধ্বংসস্তূপ হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র হিরোশিমা পরিচিতি লাভ করে।

জাপানের রাজধানী টোকিওর দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬শ' ৮০ কিলোমিটার দূরত্বে হিরোশিমা শহরের অবস্থান। বর্তমানে এই শহরটির জনসংখ্যা প্রায় ১.৮৮ মিলিয়ন। অটোমোবাইল, ইস্পাত, প্রকৌশল, জাহাজ মেরামত, খাবার প্রক্রিয়াকরণ ও আসবাবপত্র শিল্পে শহরটি এখন বিশ্বের দরবারে যথেষ্ট সমাদৃত। বলা হয়ে থাকে, হিরোশিমা উপসাগর ঝিনুকের আঁধার হিসাবে বিখ্যাত আর স্নানের ক্ষেত্র হিসাবে জাপানি সংস্কৃতির ধারক। আনুমানিক ৩শ' বছরেরও অধিককাল আগ থেকে জাপানে উৎপাদিত ঝিনুকের সিংহভাগ উৎসই এই হিরোশিমা উপসাগর।

নাগাসাকি জাপানের একটি উন্নত শহর। ১৬ শতকে পর্তুগিজ নাবিকরা জাপানী মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এই দ্বীপে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন ঘটায়। ১৫৪৩ সালে নাগাসাকি দ্বীপটিতে প্রথম ইউরোপীয় হিসাবে পর্তুগিজদের পা পড়ে। ১৮৫৯ সালে নাগাসাকিকে উন্মুক্ত বন্দর হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বন্দর নগরী নাগাসাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ নগর হিসাবে পরিণত হয়। কারণ এই দ্বিপটিতেই জাপানের রাজকীয় নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল।

**হিরোশিমা ও নাগাসাকির বীভৎস চেহারা ও বিভীষিকাময় দৃশ্য :**

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট স্থানীয় সকাল ৮ টা ১৬ মিনিটে হিরোশিমার মাটি থেকে প্রায় ২ হাযার ফুট উপর থাকা অবস্থায় 'লিটল বয়' নামক বোমাটি বিস্ফোরিত করা হয়। মুহূর্তের মধ্যে গতি, তাপ, আলো প্রভৃতি ধরনের শক্তিতে রুপান্তরিত হয়ে অভাবনীয় এক বিস্ফোরণের জন্ম দেয়। বিশাল ব্যাঙ্গের ছাতার মতো কুণ্ডলী হিরোশিমার আকাশকে ছেয়ে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে তা শহরের ৯০ শতাংশ মাটির সাথে মিশে যায়। নিমিষেই করুণ মৃত্যু হয় ৭৫ হাযার মানুষের। ডিসেম্বরের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৬৬ হাযার। তিনদিন পর নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ হাযার। গুরুতর আহত হয় ৭৫ হাযার মানুষ। বোমার তেজস্ক্রিয়ার বিকিরণের ফলে ২ লক্ষ ৩০ হাযার মানুষের মৃত্যু ঘটে। মানব দেহ সহ সবকিছু মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। ভূ-পৃষ্ঠের পাথুরে বা কংক্রিটে কেবল মানব-মানবীর দেহ অবয়বের অস্পষ্ট ছায়াচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, পশু-পাখি থেকে শুরু করে জীববৈচিত্রের প্রায় সবকিছু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়। এখনো এই দুই শহরের এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার নবজাতকরা এই নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার মূল্য দিয়ে চলেছে। ভয়াবহ হামলার স্মারক বয়ে চলেছে এই এলাকার মানুষেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।

সত্তর বছর আগের বিভীষিকা ও বীভৎসতার কথা তখনকার মানুষরাতো বটেই, বর্তমান যুগের মানুষরা এমনকি ভবিষ্যতের মানুষেরা ভুলতে পারবে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে তেমনি একজন বলেছেন সেই দুঃসহ স্মৃতির কথা। ঘটনার বর্ণনায় তিনি বলেন, 'প্রথমে মনে হ'ল আকাশ থেকে যেন একটা কালো প্যারাসুট নেমে আসছে। পরমুহূর্তেই আকাশ যেন জ্বলে উঠল। আলোর সেই ঝিলিক যে কি রকম তা বলার সাধ্য কারো নেই। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ। বিস্ফোরণের পরমুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো শত শত ভবন ও হাযার হাযার মানুষ। সেই সঙ্গে আশপাশের জিনিস-পত্র এদিক-ওদিক পড়ে জমা হ'তে থাকল। চারিদিকে আলো ও অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হামাগুড়ি দিয়ে বের হ'তে হ'ল। বাতাসে উৎকট গন্ধ। মানুষের মুখের চামড়া যেন ঝুলে পড়েছে। কনুই থেকে আঙ্গুল অবধি হাতের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কাতরাতে কাতরাতে ঝর্ণা ও নদীর দিকে ছুটে চলছে অসংখ্য মানুষ। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা। চারিদিকে অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে। নদীর তীরের কাছে একজন নারী আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে আছে। বুকদু'টা তার উপড়ানো, সেখান থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। ঘণ্টা দুয়েক পর আকাশ একটু ফিকে হয়ে গেল। ঝলসে যাওয়া হাত দু'টি থেকেও হলুদ কষ পড়ছে। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা কাতরাচ্ছে আর চিৎকার দিয়ে কাঁদছে, মাগো! মাগো! বলে। ভয়ংকরভাবে পুড়ে গেছে তারা। সারা শরীরে রক্ত গড়াচ্ছে। একে একে দেহগুলো নিথর হয়ে যাচ্ছে'।

অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিক উইলফ্রেড গ্রাহাম বুর্চেট ঘটনার চার সপ্তাহ পর হিরোশিমায় পৌঁছে পত্রিকার জন্য একটি নিউজ তৈরী করেন। তিনি লিখেছেন, 'ত্রিশতম দিনে হিরোশিমা থেকে যারা পালাতে পেরেছিলেন তারা মরতে শুরু করেছেন। চিকিৎসকরা কাজ করতে করতে মারা যাচ্ছেন। বিষাক্ত তেজস্ক্রিয়ার ভয়ে মুখোশ পরে আছেন সকলেই'। তিনি আরো লিখেছেন, 'হিরোশিমাকে বোমার বিধ্বস্ত শহর বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, দৈত্যাকৃতির একটি রোলার যেন শহরটিকে পিষে দিয়ে গেছে'। বোমায় অক্ষত থাকা মানুষগুলো দিন কয়েকপর অসুস্থ বোধ করতে শুরু করে ও হাসপাতালে যেতে থাকে। চিকিৎসকরা তাদের শরীরে ভিটামিন-এ ইনজেকশন দেয়। দেখা যায় যে, ইনজেকশনের জায়গায় গোশত পচতে শুরু করেছে। এমন মানুষদের একজনও বাঁচেনি। ৫ সেপ্টেম্বর বুর্চেটের ডেসপ্যাচটি (নিউজ) 'ডেইলি এক্সপ্রেস' পত্রিকায় ছাপা হয়। দুর্ভাগ্য হ'ল, সাহসী সাংবাদিক নিজেই তেজস্ক্রিয়ার বিকিরণে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৩ সালে ক্যান্সারে মারা যান। সে বছরই তার লেখা 'শ্যাডো অফ হিরোশিমা' বইটি প্রকাশিত হয়।

**পারমানবিক তেজস্ক্রিয়ার ক্ষয়ক্ষতি ও মানবদেহে তার প্রভাব :**

পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তার ফলে আহত হওয়া এবং পঙ্গু হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু এর শেষ পরিণতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথ'-এর তথ্য মতে, কোন মানুষ যদি ১ হাযার মিলিসিভার্ট পর্যন্ত রেডিয়েশনের শিকার হয়, তাহ'লে তাকে তেজস্ক্রিয়াজনিত অসুস্থ বলা যাবে। আর যদি ৪ হাযার মিলিসিভার্ট পর্যন্ত রেডিয়েশনের শিকার হয়, তাহ'লে বেশিরভাগ মানুষ মারা যাবে। আর ৬ হাযার মিলিসিভার্ট রেডিয়েশন হলে মানুষের বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন রেডিয়েশনের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদীও হ'তে পারে। রেডিয়েশনের অজ্ঞান ব্যক্তির দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন হবে। তার দেহের কোষ ধ্বংস হবে। ফলে রক্তক্ষরণ, মাথার চুলপড়ে যাওয়া, চামড়া কুঁচকে যাওয়া, ঘা হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেবে। পারমানবিক তেজস্ক্রিয়ার ফলে অনেকের মাঝে ছিল ক্যান্সার ও দীর্ঘস্থায়ী রোগ। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বিশাল ছিল যে, বিস্ফোরণ সংঘটনের প্রায় ১০ মাইল দূরের মানুষদেরও শরীরের চামড়া খসে পড়েছিল। বোমা হামলার সময়ই কেবল নয়, তেজস্ক্রিয়ায় কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তেজস্ক্রিয়া, পোড়া ও ক্ষতের কারণে ১৯৪৫ সালের শেষে কেবল হিরোশিমাতেই নিহত হয়েছে ৬০ হাযার মানুষ। পাঁচ বছর পর নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৩০ হাযার।

**মরণযজ্ঞের নেপথ্যে কারণ :**

ইতিহাসে এটিই ছিল সময়ের একক হিসাবে বড় গনহত্যা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সময়ে এই মরণযজ্ঞের নেপথ্যের কারণ নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হ'ল, এটি কী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বশেষ পদক্ষেপ ছিল, না-কি তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডা যুদ্ধ সূচনার প্রথম পদক্ষেপ ছিল? দ্বিতীয় প্রশ্নটি অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হ'তে আজ অবধি

বিশ্ববাসী যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব অবলোকন করছে। তারা আজ অবাধ্য। তাদের নিকট পৃথিবীবাসী আজ অবনত। মানবতা আজ অবদমিত। ৬ই আগস্ট হিরোশিমায় বোমা ফেলা হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের জিজ্ঞাসা, মানব বিধ্বংসী নতুন অস্ত্র পারমানবিক বোমা ব্যবহারের আদৌ কী কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল? এই মরণযজ্ঞের ব্যবহার আদৌ ছিল না। কেননা বোমাবর্ষণের আগের ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদের নিকট তা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। ১৯৪৫ সালের জুলাইয়ের শেষদিকে টোকিও শহরের উপর বিধ্বংসী বোমাবর্ষণ করে আমেরিকা। জাপানের সামরিক শক্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে চুরমার হয়ে গেছে। ১৯৪৫ সালের ৮ই মে বার্লিন মুক্ত হওয়ার পর জার্মানীর ন্যাৎসি বাহিনী পরাজয় মেনে নিয়ে আত্মসমার্পণ করেছে। মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট ইতালী শেষ, ইউরোপে যুদ্ধ শেষ, জাপানের সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণের জন্য ২৬ আগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছিল। জাপান আত্মসমর্পণ করার কথা ভাবতে শুরু করেছিল। তাহ'লে পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণ বা মরণযজ্ঞের নেপথ্যে কারণ কী? আদৌ কি এর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল? মূলতঃ বোমা নিক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা ছিল অন্যত্র। কিন্তু কি সে প্রয়োজনীয়তা, কি সে কারণ, যে কারণে মানবতাকে হত্যা করার মারণাস্ত্র আমেরিকা ব্যবহার করেছিল? বিশ্লেষকগণ কয়েকটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। যেমন-

প্রথমতঃ ইয়ালটা চুক্তি অনুসারে ইউরোপে যুদ্ধ শেষের পর 'সোভিয়েত রেড আর্মি' যেন এশিয়ার যুদ্ধে প্রবেশ করতে না পারে তার বন্দোবস্ত করা। রেড আর্মি জাপানে আক্রমণ করার পূর্বেই আমেরিকার কমিউনিজমের নিকট একতরফা জাপানি আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করা। এশিয়াকে কমিউনিজমের প্রভাব হ'তে মুক্ত রাখা। কমিউনিজম বিরোধী মার্কিন এই ক্রুসেডের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ জাপানী বেসামরিক নাগরিককে নিমিষে বলি দিতে মার্কিনীরা কুণ্ঠিত হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ ২৫০ কোটি ডলার খরচ করে ইতিহাসের যে ভয়ঙ্কর অস্ত্র তৈরি হ'ল, রণক্ষেত্র তার কার্যকারিতা কতটুকু সেটা যাচাই করে দেখার ইচ্ছা ছিল মার্কিনীদের *(বিবেকানান্দ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস)*।

তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীবাসীকে অবনত করতে চেয়েছিল। অপর পরাশক্তিকে (সোভিয়েত ও বিশ্বের অন্যান্য দেশকে) ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা। কিন্তু সে পরিকল্পনা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। কারণ সোভিয়েত ১৯৪৯ সালের ২৯ শে আগস্ট প্রথম পারমানবিক বোমার পরীক্ষা করেছিল। ২২ হাযার টন ডিনামাইটের শক্তিশালি প্লুটোনিয়াম বোমার বিস্ফোরণের ফলে আমেরিকার একচেটিয়া আধিপত্য থেমে যায়। কিন্তু মানব ইতিহাসে যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

**মানহাট্টন প্রজেক্ট ও পারমানবিক বোমার জন্ম :**

পারমানবিক অস্ত্র এমন এক ধরনের যন্ত্র, যা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফলে প্রাপ্ত প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করে। সে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ফিসানের ফলে অথবা ফিসার ও ফিউশান উভয়েরই সংমিশ্রণেও সংগঠিত হ'তে পারে। উভয় বিক্রিয়ার কারণেই খুবই অল্প পরিমাণ পদার্থ থেকে শিল পরিমাণে শক্তি নির্গত হয়। আধুনিক এক হাযার কিলোগ্রামের একটি থার্মো-নিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিস্ফোরণ ক্ষমতা প্রচারিত প্রায় ১ বিলিয়ন কিলোগ্রামের প্রচণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্যের চেয়েও বেশী। পারমানবিক অস্ত্রকে ধরা হয় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের এক বোমা হিসাবে। যুদ্ধের ইতিহাসে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাত্র দু'টি পারমানবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। 'লিটল বয়' হিরোশিমাতে এবং 'ফ্যাট ম্যান' নাগাসাকিতে। 'লিটল বয়' বা বামন বোমা এবং ফ্যাটম্যান বা স্থূলকায় বোমার এ ফলাফল ছিল ভয়াবহ। এছাড়া আরো প্রায় ২০০০ বার পরীক্ষামূলকভাবে এবং প্রদর্শনের জন্য এ বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং মওজুদ আছে এমন দেশগুলো হ'ল যথাক্রমে- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন, ভারত ও পাকিস্তান। এছাড়া এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, উত্তর কোরিয়া, ইসরাঈলেও পারমানবিক অস্ত্র রয়েছে। 'স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিপরি)'-এ বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে এখনো ৫ হাযারের বেশী পরমাণু অস্ত্র মোতায়েন রয়েছে। এসবের মধ্যে ২ হাযার অস্ত্র সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স, ভারত, ইসরাঈল, পাকিস্তান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ২০ হাযার ৫০০ এর বেশী যুদ্ধবোমার মালিক।

**পারমানবিক বোমার পরিচয় :**

**লিটল বয় :**

(ক) তেজস্ক্রিয় পরমাণু : ইউরেনিয়াম-২৩৫ (খ) ওযন : চার হাযার কেজি (গ) দৈর্ঘ্য : ৯.৮৪ ফুট (ঘ) পরিধি : ২৮ ইঞ্চি (ঙ) মূল আঘাত : শিমা সার্জিক্যাল ক্লিনিক (চ) বিস্ফোরণের মাত্রা : ১৩ কিলোটন টিএনটির সমান (ছ) বহনকারী বিমানের নাম : বি ২৯ সুপার ফোর্টেস (জ) পাইলটের নাম : কর্নেল পল টিবেটস (ঝ) বোমা পতনের সময় : ৫৭ সেকেণ্ড।

**ফ্যাটম্যান :**

(ক) তেজস্ক্রিয় পরমাণু : প্লুটোনিয়াম-২৩৯ (খ) ওযন : চার হাযার ছয়শত ত্রিশ কেজি (গ) দৈর্ঘ্য : ১০.৬ ফুট (ঘ) পরিধি : ৪ ইঞ্চি (ঙ) মূল আঘাত : মিতসাবিসি স্টিল, অস্ত্র কারখানা ও সমরাস্ত্র কারখানার মাঝামাঝি (চ) বিস্ফোরণের মাত্রা : ২১ কিলোটন টিএনটির সমান (ছ) বহনকারী বিমানের নাম : বি ২৯ বক্সার (জ) পাইলটের নাম : মেজর চার্লস ডবলু সুইনি (ঝ) বোমা পতনের সময় : ৪৩ সেকেণ্ড।

সুধী পাঠক! জাপানের দু'টি প্রসিদ্ধ শহরে বিশ্বযুদ্ধের সময় মাত্র দু'টি পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এতগুলো বছরের পরেও এখনও পরমাণু বোমার সেই বিভীষিকা থেকে মুক্ত হ'তে পারেনি জাপানের জনগণ। পারমানবিক বোমার তেজস্ক্রিয়ার ফলে এখনও অনেক শিশু বিকলাঙ্গ কিংবা শারীরিকভাবে ত্রুটিযুক্ত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। মাত্র দু'টি বোমায় যদি এই অবস্থা হয়, তাহ'লে পৃথিবীবাসীর নিকট রক্ষিত মোট ১৬ হাযার বোমা বিস্ফোরণ হ'লে কি অবস্থা হবে তা পরিকল্পনার বাইরে।

**পারমানবিক বোমার পরিমাণ :**

পরমাণু বিজ্ঞানীদের দেওয়া বুলেটিন থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে এখন মোট ১৬ হাযার ৩০০টি পারমানবিক বোমা মওজুদ রয়েছে। কিন্তু 'ফেডারেশন অব আমেরিকান' বিজ্ঞানীদের মতে এই বোমার সংখ্যা প্রায় ১৫ হাযার ৬৫০টি। ১৪ টি দেশে ৯৮ টি স্থানে এই বোমা মওজুদ করে রাখা হয়েছে। এছাড়াও ৮০০ পারমানবিক বোমা সম্পূর্ণ সক্রিয় অবস্থায় রাখা হয়েছে। যাতে মাত্র কয়েক মিনিটের নোটিশে সেগুলো শত্রুপক্ষের উপর নিক্ষেপ করা যায়। তবে সম্প্রতি আরেকটি বুলেটিনে জানানো হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ৭১০০টি, রাশিয়ার ৮০০০ টি, যুক্তরাজ্যের ২১৫ টি, ফ্রান্সের ৩০০টি, চীনের ২৫০টি, ইসরাঈলের ৮০টি, পাকিস্তানের ১০০-১২০টি ভারতের ৯০-১১০টি এবং উত্তর কোরিয়ার নিকট ১০টি পারমানবিক বোমা রয়েছে।

**পারমানবিক বোমার উৎপত্তির ইতিহাস :**

দুই হাযার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস পরমাণুর ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন। Atom ইংরেজী শব্দ, যার প্রতিশব্দ পরমাণু। অর্থ যাকে আর ভাগ করা যায় না। ডেমোক্রিটাসের মতে, 'পৃথিবীতে একমাত্র বিদ্যমান পদার্থ হ'ল পরমাণু'। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইনস্টাইন মানুষের চিন্তা জগতে কয়েকটি বৈপ্লবিক ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন। এই ধারণাগুলোর মধ্যে 'ভর ও শক্তির বিনিময়তা' ছিল অন্যতম। তার সেই বিখ্যাত সমীকরণটি হ'ল E=mc2। এখানে E দ্বারা শক্তি, m দ্বারা ভর এবং c দ্বারা প্রতি সেকেণ্ডে আলোর বেগকে বুঝানো হয়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আলবার্ট আইনস্টাইন এক নতুন থিওরি আবিষ্কার করেন, যা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ তার বিখ্যাত সমীকরণটির মাধ্যমে পারমানবিক বোমা আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত হয়। পারমানবিক বোমা আবিষ্কারের পিছনে মূলতঃ তথ্য সন্ত্রাস, কিছু ইহুদী কুচক্রী বিজ্ঞানীদের উৎসাহী মনোভাব, আইনস্টাইনের কুপরামর্শ ও পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলোর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়া মানব বিধ্বংসী অস্ত্র সৃষ্টির পিছনে যাদের অবদান তাদেরকে কুচক্রী বিজ্ঞানী বা তাদের পরামর্শকে কুপরামর্শ বললে অনেকেরই হৃদয়ে কাঁটা বিঁধে। কিন্তু যা বাস্তব তা বলতে বাধা কোথায়!

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগেই ফরাসী বিজ্ঞানীরা পারমানবিক বোমা ও শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে হিটলার ঘোষণা করল যে, জার্মানির হাতে এমন এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র আছে, যার গতিরোধ বা ধ্বংস করার কৌশল কারো জানা নেই।

অতঃপর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বিজ্ঞানী ছাদউইককে হিটলারের গোপন অস্ত্রের শক্তির উৎস অনুসন্ধান করার অনুরোধ করেন। ছাদউইক তার প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়েছিলেন যে, ১ থেকে ৩০ টিন ইউরিনিয়াম যোগাড় করতে পারলে এই ধরণের বোমা তৈরী করা সম্ভব। কিন্তু অটো ফ্রিস ও রুডলফ বিজ্ঞানীদ্বয় হিসাব করে দেখলেন যে, প্রাকৃতিক ইউরোনিয়ামের পরিবর্তে যদি খাঁটি ইউরোনিয়াম ২৩৫ মৌল ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে ১ থেকে ৩০ টন ইউরোনিয়ামের দরকার নেই, বরং কয়েক পাউণ্ড ইউরোনিয়াম হলেই বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব। ব্রিটিশ সরকার ছাদউইককে বোমা তৈরীর দায়িত্ব দিলেন। যে সকল ইহুদী বিজ্ঞানীরা হিটলারের ক্ষমতা দলের সাথে সাথে জার্মান ত্যাগ করেছিলেন, সেই দেশত্যাগী বিজ্ঞানীরাই ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রকে পারমানবিক বোমা তৈরীর সম্ভাব্যতার কথা বুঝিয়েছিলেন। ফলে ব্রিটিশ সরকার বিজ্ঞানীদের নিয়ে 'থমসন কমিটি' গঠন করে। এই 'থমসন কমিটি'ই পরে মড কমিটিতে রূপ নেয়। অপর দুই বাস্তুহারা বিজ্ঞানী ঝিলার্ড ও এডওয়ার্ড টেলর যুক্তরাষ্ট্রকে পারমানবিক বোমা তৈরীর ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। আইনস্টাইন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী রুজভেল্টকে কয়েকটি চিঠি লিখে এ ব্যাপারে বুঝিয়ে বলেন। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিগস কমিটি গঠন করে। ফলে পারমানবিক বোমা তৈরীর কলাকৌশল বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হয়।

পারমানবিক শক্তি বা অস্ত্র তৈরীতে একটি মহার্ঘ উপাদান হ'ল ভারী পানি। ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে একমাত্র নরওয়ের রুকানে শিল্প মাত্রায় ভারী পানি তৈরী হচ্ছিল। অতঃপর নরওয়ের এই ভারী পানির দিকে নযর দেয় জার্মানি। কিন্তু ফরাসী যুবক আলিয়ার বুদ্ধি ও কুশলতায় তা করায়ত্ত করে ফ্রান্স। ১৮৫ কিলোগ্রাম ভারী পানি ফরাসীদের হস্তগত হয়। ১৯৪০ সালের ১০ মে জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করে। জার্মানীরা ফ্রান্সের অভ্যান্তরে প্রবেশ করে ক্ষিপ্রতার সাথে অগ্রসর হ'তে থাকে। ফরাসী সরকারের পতন আসন্ন ঠিক সেই মুহূর্তে ভারী পানি লন্ডনে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়।

১৯৪১ সালে পারমানবিক বোমা নির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের 'টিউব এলয়েজ' নামক একটি সংস্থা গঠিত হয়। একই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে 'ম্যানহাটন' প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২ সালে। অনেক কাঠখড় পোড়ানের পর অবশেষে ১৯৪৫ সালে পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়। ১৯৪৫ সালে ১৬ জুলাই সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা আগে বিস্ফোরিত হয় প্রথম পারমানবিক বোমা। পৃথিবীর এই প্রথম পারমানবিক বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করতে যে সব বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন তাদের সবারই মোটামুটি একই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, ওপেনহাইমার স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে, 'উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ হেসেছিলেন, কয়েকজন কেঁদে ফেলেছিলেন, তবে বেশীর ভাগ ছিলেন স্তব্ধ'।

**উপসংহার :**

হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমার ধ্বংসযজ্ঞ দেখে আঁতকে উঠেছিল পৃথিবীবাসী। তবে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অনুশোচনার কোন চিহ্ন অবলোকন করা যায়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল দু'জনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। হিরোশিমা-নাগাসাকির খবর পেয়ে তারা অভিভূত হয়েছিলেন এবং আশেপাশের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, This is the greatest thing in history. It's time for us to get home.

তবে নিশ্চুপ ছিলেন আইনস্টাইন। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কি ধরণের অস্ত্র ব্যবহার হ'তে পারে'। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'I Know most with what weapons world war 111will be fought, but world war iv will be fought with sticks and stongs'.

তিনি হয়তো ধারণা করে এই বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা এটাই। কারণ ৫০'এর দশকের শুরুর দিকে রাশিয়া এবং আমেরিকা পারমানবিক বোমার এক নোংরা প্রতিযোগিতায় নামে। মার্কিনীরা ২০ কিলোটন TNT সমপরিমাণ বিস্ফোরণ ঘটালে রাশিয়া ফোটাবে ৪০ কিলোটন TNT সমপরিমাণ। আমেরিকা ১ মেগাটন ফোটালে রাশিয়া ১০ মেগাটন ফোটাবে। এই নোংরা খেলা চলে প্রায় ২৫ বছর। ১৬ কিলোটন TNT সমপরিমাণ বোমার টেলায় হিরোশিমা ও নাগাসাকি উড়ে গিয়েছিল। এখন আমরা মেগাটনের সময়ে উপস্থিত হয়েছি। পারমানবিক বোমার নোংরা খেলা খেলতে খেলতে এক সময় দেখা যাবে সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি আবার পড়েছে কোন হিরোশিমা-নাগাসাকি নামক নগরীর উপর। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার উপর ভিত্তি করে প্রযুক্তি ভুল ব্যবহারের কারণে দিতে হয়েছে অসংখ্য প্রাণের আত্মাহুতি। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের আত্ম অহংকারের কারণে আবার যেন কোন প্রাণীর আত্মাহুতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!!

*[লেখক : এম. এ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]*

# দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

*ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

## আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (খ)
## জিহাদ আন্দোলন (২য় পর্যায়)

**৩- মাওলানা এনায়েত আলীর ২য় ইমারত (১২৬৯-৭৪/১৮৫২-১৮৫৮ খৃঃ) :**

বালাকোট বিপর্যয়ের পর বড়ভাই বেলায়েত আলীর নির্দেশে মাওলানা এনায়েত আলী দীর্ঘ সাত বছর বা তার বেশী সময় যাবত বাংলাদেশের যশোর বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা হ'তে বৃহত্তর খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকায় দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় উত্তর ২৪ পরগনার হাকিমপুর কেন্দ্রে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন হাজী মুফীযুদ্দীন খাঁ ও মদন খাঁ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল মসজিদ নির্মাণ ও সেখানে ইমাম নিয়োগ করা। ইমামদেরকে নিয়মিত ছালাতের ইমামতি ছাড়াও এলাকার গন্ডগোল মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হ'ত। যাতে কোন মুসলমান ইংরেজের আদালতে বিচার না নিয়ে যায়। এইভাবে তাঁরা দু'ভাই একপ্রকার অঘোষিত সরকার পরিচালনা করেছিরেন।[৪৬] ১৮৪৭ হ'তে দু'বছর নযরবন্দী থাকাকালীন সময়েও তিনি বাংলাদেশে তাবলীগী সফরে থাকতেন। ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারীতে সিত্তানার ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।[৪৭]

বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পরে সিত্তানা ঘাঁটিতে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি দ্বিতীয়বার আমীর নির্বাচিত হন। অতঃপর এই ঘাঁটি রেখে দিয়েই তিনি পার্শ্ববর্তী মঙ্গলথানায় 'দারুল ইমারত' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মাওলানার এই ২য় ইমারতকাল ১ম ইমারতকাল (১২৫৯-৬২/১৮৪৩-৪৬ খৃঃ)-এর ন্যায় গৌরবময় ছিল না। একদিকে বাইরের চাপ অন্যদিকে তাঁর সুহৃদ মঙ্গলথানার দুই সর্দারের মধ্যে আপোষ দ্বন্দ্ব, আযাদীপাগল সুহৃদ সিত্তানার সর্দার সাইয়িদ আকবার শাহের মৃত্যু এবং অন্য সর্দারদের চিরাচরিত সুবিধাবাদী নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতায় অতিষ্ঠ হয়ে অধিকাংশ মুজাহিদ এমনকি নিজের ভাই ও পরিবারবর্গ মাওলানাকে ছেড়ে হিন্দুস্থানে ফিরে এসেছিলেন।[৪৮] এরই মধ্যে ১৮৫৭ সালের ২৯ শে মার্চ কলিকাতর নিকটে বহরমপুর ও ব্যারাকপুরে বিপ্লবের মাধ্যমে যে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং পরে ১০ই মে তারিখে মীরাটে কয়েদীমুক্তি ও ইংরেজ অফিসার হত্যার মাধ্যমে যা সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে, ঐ সময় ২০শে জুলাই তারিখে মাওলানা নারেঞ্জী নামক স্থানে ইংরেজদের উপরে প্রচণ্ড হামলা পরিচালনা করেন। অতঃপর শেখজানা ও শীওয়া নামক স্থানে তাদের উপরে হামলা করেন।[৪৯] ইংরেজরা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা তখন এই সহায়-সম্বলহীন মুষ্টিমেয় গাযীদেরকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়। ঘুষ ও কুটনীতির মাধ্যমে সর্দারদেরকে হাত করা হয়। ছাদিকপুর কেন্দ্রর উপরে এবং রসদ আনার সম্ভাব্য সকল পথে কড়া পাহারা বসানো হয়।[৫০] ফলে একপ্রকার নিঃস্ব অবস্থায় মুজাহিদগণ একটি প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকেন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে মাওলানার অনুমতি নিয়ে একসময় মাত্র চারজন বাদে সকল গাযী মাওলানাকে ছেড়ে যায়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৮ হ'তে অনাহার শুরু হয়। গাছের ছাল-পাতা সম্বল হয়।[৫১] অতঃপর প্রচণ্ড জ্বর ও অনাহারক্লিষ্ট অবস্থায় মঙ্গলথানা হ'তে চানাই যাওয়ার পথে ৭ই শা'বান ১২৭৪ মোতাবেক ২৩শে মার্চ ১৮৫৮-তে চানাই পাহাড়ের চড়াইয়ে ৬৭ বৎসর বয়সে মাওলানা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৫২] ইন্নালিল্লাহ ...........রাজি'উন। তাঁর মৃত্যুর পরপরই ব্যাপক ও লাগাতার ইংরেজ হামলায় পাঞ্জতার, চাংগালাই, মঙ্গলথানা ও সিত্তনার ঘাটিসমূহ একে একে ধ্বংস হয়ে যায়।[৫৩]

**মাওলানা এনায়েত আলীর ব্যক্তিত্ব :**

মাওলানার কর্মোদ্দীপনা ছিল কিংবদন্তীর মতো। যেকাজেই তাঁকে লাগানো হ'ত, সেকাজেই তিনি সেরা প্রমাণিত হতেন। যখন থেকেই তিনি আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও আল্লামা ইসমাঈল (রহঃ)-এর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন থেকেই এই জমিদারপুত্র সকল আরামকে হারাম করে আমীরের নির্দেশ মোতবেক দাওয়াত ও জিহাদের পথে জানমাল ওয়াক্ফ করে দেন। তাঁর দাওয়াতী তৎপরতার প্রায় সবটুকু সময় কেটেছিল বাংলাদেশ অঞ্চলে। দুইবার প্রায় একযুগ বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজে তিনি যে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন, তার তুলনা হয় না। ফলে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সীমান্তের সশস্ত্র জিহাদে বাংগালী মুসলমানেরাই অধিক সংখ্যায় যোগদান করে, যা তাঁর মৃত্যুর পরেও জারি থাকে। বাংলাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক আহলেহাদীছ থাকার মূলে তাঁরই অবদান ছিল সবচাইতে বেশী। তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের মধ্যে একটি ঘটনা নিম্নরূপ :

একদা পাবনা শহরে তাবলীগে এসে তিনি 'চাপা মসজিদে' ওঠেন। সেদিন ছিল মাদার পীরের বাঁশ উঠানো উৎসব। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিরাট আকারে উৎসব চলছিল। মাওলানা সোজা উৎসবমঞ্চে উঠে গিয়ে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে এক দরদমাখা জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। উৎসবের হোতা গাদল খাঁ সহ উপস্থিত শত শত লোক তওবা করে মাওলানার হাতে বায়'আত করেন। পাবনার রাধাকান্ত পুরের উক্ত গাদল খাঁ ও তার পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আলী খাঁ আজীবন জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।[৫৪]

জীবনের শেষ ধাপে এসে মাওলানা এনায়েত আলী একথা প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, জিহাদের পথ ফুলশয্যার পথ নয়, এ পথ দারুণভাবে কাঁটাবিছানো পথ। জিহাদের খুনরাঙা পথ বেয়েই আসে মানবতার মুক্তি, আসে জান্নাতের সুবাতাস। মূলতঃ এই গাযীদের রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়েই এসেছিল ১৯৪৭-এর রক্তিম স্বাধীনতা।

---

৪৬. 'সারগুযাস্ত', পৃঃ ২৮৩।
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪; মাসঊদ আলম নাদবী এই দ্বিতীয় মেয়াদকে তিনবছর বলেছেন।- 'ইসলামী তাহরীক', পৃঃ ৫০।
৪৮. 'সারগুযাস্ত', পৃঃ ২৬৬, ২৭৩।
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮০; সিপাহী বিদ্রোহের তারিখ দ্র. ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস (ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৪), পৃঃ ৫৬১।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৪।
৫১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৪-২৮৫।
৫২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯, ২৯০, ২৯১।
৫৪. সূত্র : অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল মাজেদ সালাফী (৫৫), তাঁর পিতা গাযী মাওলানা আবদুল ওয়াহেদী সালাফী হ'তে। সাং হেমায়েতপুর, পাবনা। সাক্ষাৎকার : মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, যেলা গাইবান্ধা।- তাং ১৪.১০.৮৯ ইং।

**৪- আমীর আবদুল্লাহ বিন বেলায়েত আলী (১২৭৮-১৩২০/১৮৬২-১৯০২) :**

১৮৫৮ সালের ২৩শে মার্চ আমীর মাওলানা এনায়েত আলীর মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া ইমারত বোর্ডের প্রধান মাওলানা নূরুল্লাহ কাবুল যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সদস্য মাওলানা শাহ ইকরামুল্লাহ ইংরেজ ও স্থানীয় গাদ্দার পাঠান মুসলিম বাহিনীর সম্মিলিত হামলায় ত্রিশজন সাথীসহ ৪ঠা মে তারিখে সিত্তানা ঘাটিতে শহীদ হন।[৫৫] এই সময় মাওলানা মাকছূদ আলী আযীমাবাদী সীমান্তে এসে পৌঁছলে বেঁচে যাওয়া মুজাহিদগণ তাঁকে আমীর হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৬২ সালে তিনি অর্শরোগে মারা যান। ঘাঁটির দুর্দশার খবর পেয়ে মাওলানা বেলায়েত আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবদুল্লাহ (১২৪৬-১৩২০/১৮৩১-১৯০২) সপরিবারে সীমান্তে পৌঁছে যান এবং সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে 'আমীর' হিসাবে বরণ করে নেন। তিনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর আমীর ছিলেন এবং এটাই ছিল পরবর্তী জিহাদ আন্দোলনের স্বর্ণযুগ।[৫৬]

তাঁর ইমারতকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল আম্বেলা যুদ্ধ।[৫৭] ১৮৬৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বের সংঘটিত এই স্মরণীয় যুদ্ধে মুল্কা মুজাহিদ ঘাঁটির পতন ঘটে। ইংরেজ সেনাপতি চেম্বারলীনের নেতৃত্বে ইংরেজ ও গাদ্দার স্থানীয় বাহিনী ছাড়াও হান্টার-এর মতে স্থানীয় গোত্রীয় বাহিনী ছিল ৫৩,৫০০ শত। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সাইয়িদ আবদুল জাব্বার সিত্তানবীর সঠিক হিসাব মতে ছ'টি স্থানীয় মুসলিম গোত্রের মোট যোদ্ধাসংখ্যা ছিল ৬৪,২৫০। পক্ষান্তরে মুজাহিদবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র বার থেকে চৌদ্দশোর মধ্যে।[৫৮] মুজাহিদগণের দশটি জামা'আতের ৯টি ছিল হিন্দুস্থানী ও ১টি ছিল স্থানীয়। কিন্তু হিন্দুস্থানীদের অধিকাংশই ছিলেন বাংগালী মুজাহিদ। খোদ আমীর আবদুল্লাহ যে 'জামা'আতে আবদুল গফুর'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাকে 'সরকারী জমঈয়ত' বলা হ'ত, তার সকলেই ছিলেন বাংগালী।[৫৯] গোলাবারুদ ও আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় পৌনে এক লক্ষ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ অস্ত্রের অধিকারী কিঞ্চিদধিক হাযার খানের মুজাহিদের এই অসমযুদ্ধে ২৩৮ জন ইংরেজ অফিসারসহ মোট ৩০০০ হাযার শত্রু সৈন্য নিহত ও ৪০০ শত মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন।[৬০] এই লড়াইয়ে আমীর আব্দুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী যে অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন, তা জিহাদের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। স্থানীয় পাঠান সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা ও লোভী চরিত্রই ছিল এই যুদ্ধে মুজাহিদগণের পরাজয়ের মূল কারণ।

মুল্কার পতনের পর আশ্রয়হারা ৭/৮ শত মুজাহিদ বিভিন্ন স্থানে ঘাঁনি স্থাপন করে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু সর্বত্র স্থানীয় খান ও আফগানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা একে একে আটবার ঘাঁটি পরিবর্তনে বাধ্য হন। ১৮৯১ সালের মার্চ মাসে 'গাযীকোট' যুদ্ধর পর আমীর আব্দুল্লাহ স্বয়ং বিভিন্ন গোত্রের নিকটে সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ব্যাকুল মনে আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করেন। 'মুবারক খেল'-এর 'টিলওয়ারী' নামক যে টীলার উপরে বসে তিনি এই কাতর প্রার্থনা করছিলেন, হঠাৎ করে তা ভূমিকম্পের ন্যায় দুলে ওঠে। স্থানীয়রা এতে ভীত হয়ে তাঁর নিকটে দৌড়ে এসে ক্ষমা চায় ও আজীবন সেখানে থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করে।[৬১] আমীর আব্দুল্লাহ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করে জিহাদ পরিচালনা করেন। এখানে ১৩২০ হিজরীর ২৭শে শা'বান মোতাবেক ১৯০২ সালে ২৯শে নভেম্বর ৭৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৬২]

**৫- আমীর আবদুল করীম বিন বেলায়েত আলী (১৩২০-৩৩/১৯০২-১৫) :**

আমীরুল মুজাহিদীন আমীর আব্দুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর তাঁর ছোট ভাই মাওলানা আবদুল করীম বিন বেলায়েত আলী (১২৫৫-১৩৩৩/১৮৩৮-১৯১৫) মুজাহিদগণের আমীর নির্বাচিত হন। তিনি 'টিলওয়ারী' ছেড়ে 'আসমাস্ত' গিয়ে ১৯০২ সালে নতুন ঘাঁটি নির্মাণ করেন।[৬৩] তিনপাশ দিয়ে প্রবাহিত বরেন্দু নদী ও পাহাড় ঘেরা সমতল এই নির্জন স্থানটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। এখানকার মাটিও ছিল বেশ উর্বর। ফলে মুজাহিদদের চাষ-বাসের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এখানে মুজাহিদগণের প্রায় সবাই ছিলেন বাংগালী ও বিহারী।[৬৪]

আমীর আবদুল করীম-এর সময়ে (১৯০২-১৯১৫) ছোটখাট যুদ্ধে সংঘটিত হলেও তার কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সেই সময় হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরে যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল। সাইয়েদ আহমাদ ও আল্লামা ইসলাঈল গোলামীর শৃংখল ভাঙার যে তূর্যধ্বনি করে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, তা ক্রমে জনমনে স্বানীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে এবং হিন্দুস্থানের সর্বত্র বৃটিশ বিতাড়ন ও স্বাধীনতা অর্জনের ঢেউ ওঠে। মুজাহিদনেতা হিসাবে আমীর আবদুল করীম সকল হিন্দুস্থানী মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বিশেষ করে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও ঘনিষ্টতা ছিল সুনিবিড়। একবার মুজাহিদগণের জন্য একজন বিশ্বস্ত ডাক্তারের প্রয়োজন-একথা জানিয়ে আমীর আব্দুল করীম সংবাদবাহক পাঠান মাওলানা আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) একজন মেডিকেল ছাত্র যে তখনও শেষ ডিগ্রী হাছিল করেনি, তাকে আসমাস্ত পাটিয়ে দেন।[৬৫]

মাওলানা আবদুল করীম ১৩৩৩ হিজরীর ২৫শে রবীউল আউয়াল মোতাবেক ১৯১৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ফজরের ওয়াক্তে 'আসমাস্ত'-এর মারা যান ও ঘাঁটির কবরস্থানে সমাহিত হন। তিনি মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও আমীর আবদুল্লাহ পরিচালিত জিহাদী কাফেলার সর্বশেষ নেতা ছিলেন, যাঁর মৃত্যুর ফলে ইমারতের সেই পবিত্র ভাবমূর্তি ও যুগ শেষ হয়ে যান, যার গোড়াপত্তন হয়েছিল- যা পূর্বে ছিল না। আমীর আব্দুল করীম হাফেযে কুরআন ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় তেলাওয়াত ও ছালাতে নিমগ্ন থাকতেন। সুদক্ষ ও শক্তিশালী এই নেতা সারাটি জীবন ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ ও লড়াইয়ে ব্যয় করেছেন। প্রথম জীবনে চাচা এনায়েত আলীর ঝাণ্ডাতলে ও পরে বড় ভাই আমীর আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে এবং জীবনের শেষ বারো বছর প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় এবং রাতগুলো অতিবাগিত হ'ত স্বীয় প্রভুর হুযুরে রুকু-সিজদা ও তেলাওয়াতের মধ্যে।[৬৬]

***বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ৩০২-৩০৭]***

---

৫৫. মেহের, 'সারগুযাস্তে মুজাহিদীন', পৃঃ২৯৬।
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০২-৩০৩।
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩১।
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৯।
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৪-৩১৫।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৮।
৬১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৪।
৬২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৮।
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭১।
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৩।
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৬।
৬৬. আবাদ শাহপুরী, 'সাইয়িদ বাদশাহ কা কাফেলা' (লাহোর : আল-বদর পাবলিকেশন্‌স, জুন ১৯৮১), পৃঃ ৪১৮-১৯।

# আহলেহাদীছ পরিচিতি

-আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)

(২য় কিস্তি)

(١١) وما صح فيه خلاف من واحد عنهم رضي الله عنهم او لم يتيقن ان كل واحد منهم رضي الله عنهم عرفه ودان به فليس اجماعا. لان من ادعي الاجماع ههنا فقد كذب وقفا مالا علم له به.

(১১) 'যে বিষয়ে একজন ছাহাবীরও মতানৈক্য সঠিকভাবে প্রমাণিত হইবে অথবা নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হইবেন যে, তাহারা সকলেই উক্ত বিষয় অবগত ছিলেন ও উক্ত ব্যবস্থা পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ইজমা নয়, এরূপ ক্ষেত্রে ইজমার দাবী মিথ্যা এবং অপরিজ্ঞাত ও অনিশ্চিত বিষয়ের দাবী মাত্র'।

(١٣) ولا يجوز البتة ان يجمع اهل عصر ولو طرفة عين علي خطاء ولا بد من قائل بالحق فيهم.

(১২) 'এক যুগের সমুদয় মুসলিমের এক মুহূর্তের তরেও কোন ভ্রান্তিতে একমত হওয়া অর্থাৎ তাঁহাদের ইজমা করার ধারণা করা জায়েয নয়, উম্মতের মধ্যে কেহ না কেহ সত্যপথের পথিক অবশ্যই থাকিবেন'।

(١٤) وليس الإجماع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم لأن أهل كل عصر بعد عصر الصحابة ليس جميع المومنين وانماهم بعض المومنين او الاجماع إنما هو إجماع جميع المومنين لاجماع بعضهم ولا سبيل الي تيقن اجماع عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم لكثرة اعداد الناس بعدهم ولالهم طبقوا ما بين المغرب والمشرق.

(১৩) 'ছাহাবাগণের (রাঃ) যুগের পর কোন বিষয়ে কার্যতঃ ইজমা ঘটিতে পারে না; কারণ ছাহাবীগণের পরবর্তীকালে পৃথিবীর কোন যুগ শুধু মুসলিম অধ্যুষিত ছিল না এবং তাঁহাদের সর্বসম্মতি লাভ করাও সম্ভবপর ছিল না। পরবর্তী যুগের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত কতক মুসলিমের সিদ্ধান্ত মাত্র আর সমুদয় মুসলিমের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের নাম ইজমা। ছাহাবীগণের পর একযুগের সমুদয় মুসলিমের ইজমা প্রমাণিত না হইবার কারণ এই যে, পরবর্তীকালে মুসলিমগণের সংখ্যা অতিশয় বর্ধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা ভূমণ্ডলের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন'।

(١٤) والواجب إذا اختلف الناس او نازع واحد في مسئلة ما ان يرجع الي القران وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم لا الي شئي غير هما ولا يجوزالي عمل المدينة ولا غيرهم- من رجع الي قول انسان دون رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد خلف امر الله تعالي بالرد اليه والي رسوله لاسيما مع تعليقه تعالي ذلك بقوله : ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر-ولم يامر الله تعالي قط بالرجوع الي قول بعض المومنين دون جمعهم.

(১৪) 'কোন বিষয়ে মতভেদ এবং কোন মাসআলা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হইলে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব, উক্ত দুই বস্তু ছাড়া অপর কোন কিছুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা বিধেয় নয়। মদীনাবাসী অথবা অন্য কোন নগরের অধিবাসীবৃন্দের আচরণ দলীল স্বরূপ গ্রাহ্য করা জায়েয হইবে না। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাড়া অপর কোন মানুষের উক্তিকে দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিবে, সে আল্লাহ্‌র আদেশের ‍বিরচরণকারী হইবে। কারণ আল্লাহ্‌র আদেশ ছিল শুধু তাঁহার ও তদীয় রাসূলের (ছাঃ) উক্তিকে বিচারক মান্য করার। বিশেষতঃ আল্লাহ তদীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বিচারক মান্য করার জন্য আল্লাহ শর্ত নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করিয়া থাক' *(নিসা ৪/৫৯)*। সুতরাং আল্লাহকে বিশ্বাস করিলে ও পরিণাম দিবসের উপর আস্থা থাকিলে মতভেদ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের (ছাঃ) মীমাংসাকেই অগ্রগণ্য করিতে হইবে। মীমাংসার এই পদ্ধতি যাহাদের মনঃপুত হইবে না আল্লাহ ও চরম দিবসের উপর তাহাদের ঈমানের দাবীও গ্রাহ্য হইবে না। আল্লাহ কখনই সমগ্র মুসলিমের পরিবর্তে কতিপয় মুসলিমের নির্ধারণ মান্য করিবার নির্দেশ দেন নাই'।

(١٥) ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالراي

(১৫) 'দ্বীনের ব্যাপারে অনুমান করিয়া অথবা অভিমত খাটাইয়া কথা বলা সিদ্ধ নয়'।

(١٦) وافعال النبي صلي الله عليه وسلم ليس فرضا الا ما كان منها بما فالامر فهو حينئذ امر لكن الايتساء به عليه الصلوة والسلام فيها حسن.

(১৬) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যক্তিগত কার্যাবলী যদি আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে না হয়, তাহা হইলে উম্মতের জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় ফরয হইবে না; আদেশ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে হইলে সেই কার্য আদেশের পর্যায়ভুক্ত হইবে। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ)-এর সকল প্রকার আচরণকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা উত্তম'।

(١٧) ولا يحل لنا اتباع شريعة نبي قبل نبينا صلي الله عليه وسلم.

(১৭) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ববর্তী নবীগণের শরী'আত অনুসরণ করিয়া চলা আমাদের জন্য হালাল হইবে না'।

রায় শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে হাফিয ইবনু হযম বলিতেছেন, বিনা প্রমাণে হালাল, হারাম ও ওয়াজিব সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া আদেশ দেওয়া।

وهو الحكم في الدين بغير نص بل بما يراه المفتي احواط واعدل في تحليل والتحريم والايجاب- حلشبهم المحلي لليسد محمد بن اسماعيل اليماني.

এই শ্রেণীর রায়ের অসিদ্ধতা সম্পর্কে সমুদয় আহলেহাদীছ একমত। কিন্তু যে রায় বা ক্বিয়াস কুরআন ও সুন্নাতের সাধারণ নির্দেশকে ভিত্তি করিয়া তাহার ইঙ্গিত, প্রতিপাদ্য ও নযীরের উপর অবলম্বিত হয় তাহার অসিদ্ধতা সম্পর্কে আহলেহাদীছগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। অধিকাংশ আহলেহাদীছ আলেম এরূপ রায় বা ক্বিয়াসকে বৈধ বলিয়াছেন' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, পৃঃ ১৪৩)*।

(١٨) ولا يحل لاحد ان يقلد احدا لاحيا ولاميتا وعلي كل احد من الاجتهاد حسب طاقته.

(১৮) 'কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করা কাহারো জন্য জায়েয হইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধ্যানুসারে ইজতিহাদ করার জন্য যত্নবান হইতে হইবে'।

(١٩) فمن يسال عن دينه فانما يريد معرفة ماالزمه الله عز و جل في هذا الدين- ففرض عليه ان كل اجهل البريمة ان يسال عن اعلم اهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا دل عليه ساله-

فاذا افتاه قال له هكذ قال الله عز و جل ورسوله؟ فان قال : نعم. اخذ بذلك و عمل به ابدا– فان قال له : هذا راي او هذا قياس او هذا قول فلان وذكر له صاحبا او تابعا او فقيها قديما او سكت او انتهي او قال له : لا ادري فلا يحل له ان ياخذ بقوله ولكن يسئال غيره.

(১৯) 'যে ব্যক্তি ধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয় অবগত হইতে চাহিবে, তাহাতে ইহাই জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে যে, জ্ঞাতব্য বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ কি? যদি সে গণ্ডমূর্খ হয়, তাহা হইলে তাহার উপর ফরয যে, সে ব্যক্তি দ্বীনের সর্বাপেক্ষা শীর্ষস্থানীয় আলিম, অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) যে বিষয় সহ প্রেরিত হইয়াছেন সেই বিষয়ের বিদ্যায় যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী তাঁহাকে মাসাআলা জিজ্ঞাসা করিবে। মাসআলার উত্তর প্রাপ্ত হইলে কি ঐ কথা বলিয়াছেন? যদি সেই আলিম বলেন, হ্যাঁ, তাহা হইলে তাঁহার জওয়াব মান্য করিয়া নিঃসংশয়ে তদনুযায়ী কার্য করিবে। আর যদি সেই আলিম বলেন যে, উক্ত জওয়াব তাহার ব্যক্তিগত অনুমান-ক্বিয়াস অথবা অমুক ছাহাবী, তাবেঈ বা ফক্বীহের উক্তি মাত্র, পূর্ববর্তী ফকীহ হউন অথবা আধুনিক অথবা সেই আলিম প্রশ্নের উত্তর না দিয়া যদি চুপ করিয়া থাকেন বা প্রশ্ন শুনিয়া গর্জন করিয়া উঠেন অথবা যদি বলেন, 'আমি জানিনা' তাহা হইলে উক্ত মাসআলা সম্পর্কে তাঁহার জওয়াব অনুযায়ী কার্য করা সংগত হইবে না, অন্য আলিমকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে'।

(٢٠) واذا قيل له اذا سال عن اعلم اهل بلده بالدين : هذا صاحب حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم وهذا صاحب راي وقياس فليسئل صاحب الحديث ولا يحل له ان يبال صاحب الراي اصلا.

(২০) 'যদি কোন স্থানে এরূপ দুইজন বিদ্বান বাস করেন যে, তন্মধ্যে একজন হাদীছ বিদ্যায় পারদর্শী এবং অপর ব্যক্তি রায় ও ক্বিয়াস বিদ্যায় সুপণ্ডিত, সেরূপক্ষেত্রে হাদীছ পারদর্শী আলিমকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হবে, রায় বাগীশকে কিছুতেই জিজ্ঞেস করা চলবে না'।

(٢١) المجتهد المخطئ افضل عند الله تعالي من المقلد المصيب–

(২১) 'যে মুক্বাল্লিদ (বিনা প্রমাণে ব্যক্তি বিশেষের উক্তির অনুসরণকারী) মাসআলার জওয়ার সঠিক প্রমাণ করতে পেরেছেন তাঁর অপেক্ষা যে মুজতাহিদ কুরআন ও হাদীছের গবেষণায় নিবিষ্ট হইয়াও ভ্রমে পতিত হয়েছেন, তিনিই আল্লাহ্‌র কাছে শ্রেষ্ঠতর'।

(٢٢) و الحق من الاقوال في واحد منها وسائرها خطاء وبالله التوفيق.

(২২) 'ভিন্ন ভিন্ন উক্তি সমূহের মধ্যে মাত্র একটি উক্তি সঠিক, অবশিষ্ট সমুদয় উক্তি ভ্রান্তিমূলক'।

(٢٣) الله الله عباد الله اتقوا الله في انفسكم ولا يغرنكم اهل الكفر والالحاد ومن كلامه بغير برهان لكن تمويهات ووعظ علي خلاف ما اتاكم به كتاب ربكم و كلام نبيكم صلي الله عليه وسلم فلا خير فيما سواهما–

(২৩) 'সাবধান! সাবধান! আল্লাহ্‌র দাসগণ আল্লাহকে মনে প্রাণে সমীহ কর! কুফর ও নাস্তিকতাবাদীদের কবলে পড়িও না এবং যারা বেদলীল কথা বলে, তাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ো না। তাদের ধোঁকা ও প্রতারণা কেবল মৌখিক দাবী এবং তোমাদের প্রভুর গ্রন্থ ও তোমাদের নবীর (ছাঃ) উক্তির বিরুদ্ধ বক্তব্য মাত্র। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে মঙ্গল নিহিত নেই'।

(٢٤) واعلموا ان دين الله ظاهر لا باطن فيه ظهر لا سر تحته كله برهان ولاسابحة فيه– واتهموا كل من يدعو ان يتع بلا برهان وكل من ادعي الدبانة سرا وباطنة فيسمي دعاءي و محارق. واعلموا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فيما فوقها ولا اطلع اخص الناس به من زوجة او ابنة او عم او ابن عم او صاحب علي شئي من الشريعة كقمة عن الاحمر والاسواد ورعاة استغنم ولا كان عنده عليه الصلوة والسلام سر ولا رسز ولا باطن غير ما دعي الناس كلهم اليه ولو كتمهم شئيا لما بلغ كما ار وان قال هذا فهو كفر!

(২৪) 'জানিয়া রাখ! আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রকাশিত। তাহার মধ্যে গুপ্ত রহস্যের স্থান নেই। দ্বীনের সমস্তই স্পষ্ট, তাহার ভিতরে কোন নিভৃতি ও হেঁয়ালী নেই। দ্বীনের সমস্তই দলীল, তাহাতে কোন অস্পষ্টতার লেশ নেই। যাহারা বেদলীল কথা অনুসরণ করিবার জন্য আহ্বান করিবে তাহাদেরকে ধার্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিও না। আর যে ব্যক্তি ধর্মের কোন অংশকে গোপনীয় বা রহস্যমূলক বলিয়া প্রচার করিবে তাহাকে গলাবাজ ও ভোজবাজ বলিয়া জানিবে। জানিয়া রাখ! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শরী'আতের একটি কথাও গোপন করেন নাই। শরী'আতের যে সকল কথা তিনি তাহার স্ত্রী, কন্যা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র, সহচর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহার কোন অংশ তিনি কোন শ্বেতাংগ বা কৃষ্ণকায়, এমনকি রাখালদের কাছেও গোপন করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমগ্র মানবজাতিকে যে সকল বিষয়ের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন সেই সকল বিষয় ছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন গুপ্ত কথা বা হেঁয়ালী ছিল না। যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীনের কণামাত্রও গোপন করিয়া থাকেন তাহলে তাবলীগের ফরয তিনি প্রতিপালন করেন নাই। আর এ কথা যে বলিবে সে কাফির'।

(٢٥) فاياكم وكل قول لم يبس سوحله ولا وضح دليله ولا تعوجا عن ما معني عليه نبيكم صلي الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم و جملة الخير كله ان تلزموا ماقص عليكم ربكم تعالي في القران بلسان عربي مبين– لم يقول فيه من شئي تبيبا له لكل شئي وما صح نبيكم صلي الله عليه وسلم برواية الثقات من امة اهل الحديث رضي الله عنهم مسندا اليه صلي الله عليه وسلم فهما طريقان يصلا نكم الي رضاء ربكم عز و جل. لا اله الا الله محمد رسول الله!

(২৫) 'অতএব মুসলিমগণ সাবধান! এরূপ প্রত্যেক কথা, যাহা রাসূলের (ছাঃ) পথের সন্ধান দেয় না ও যাহার স্পষ্ট দলীল নেই এবং যে পথে নবী করীম (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণ চলিয়া গিয়াছেন, তাহার দিকে পরিচালিত করে না, সেই সকল কথা সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী। সকল কল্যাণের সারংসার এই যে, তোমাদের মহিমান্বিত প্রতিপালক স্পষ্ট আরবী ভাষায় কুরআনে যা বর্ণনা করিয়াছেন, যেগ্রন্থে সমস্ত কথাই সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে কোন বিষয় পরিত্যক্ত হয় নাই তাহা আঁকড়িয়ে ধর এবং আহলেহাদীছগণের বিশ্বস্ত বর্ণনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যে সকল আদেশ নিষেধ প্রমাণিত হইয়াছে তা অবলম্বন করিয়া চল, তবেই তোমরা তোমাদের মহিমান্বিত প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করিতে সমর্থ হইবে'।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!!

*[দ্রষ্টব্য : আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী প্রণীত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' গ্রন্থ, পৃঃ ১১৯-১২৭]*

# রক্তপিপাসু শী'আ হূছী : বিপর্যস্ত ইয়ামান

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

**ভূমিকা :**

মসজিদে নববীর মিম্বারে জিহাদের উপর অগ্নিঝরা বক্তব্য শুনলাম। একটু আশ্চর্য হলাম। সেদিন কে বক্তব্য দিচ্ছিলেন তা স্মরণ করতে পারছি না। পরে শুনলাম ইয়ামানের সাথে সঊদী আরবের কিছু হচ্ছে। তারপরের সপ্তাহে জেদ্দাতে ছিলাম। সেখানকার এক মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করলাম। সেখানে খতীব সঊদী বাদশাহ্র 'নছীহতে হারামাইন শরীফাইন'-এর হেফাযতক্রমে সাধারণ জনগণকে বাদশাহ্র সাথে থাকার উদাত্ত আহ্বান জানালেন এবং শী'আ সম্প্রদায় সম্পর্কে হেকমতের সাথে পর্যালোচনামূলক মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন। সেদিন পুরো সঊদী আরবে একই বিষয়ের উপর বক্তব্য হয়েছে। দেশের পার্লামেন্ট হচ্ছে মসজিদ। এমপি হচ্ছেন মসজিদের ইমাম। সংবিধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। সত্যিই রোমাঞ্চকর এক অনুভূতি। এরকম একটা শাসন ব্যবস্থা যদি পৃথিবীতে থাকত, তাহ'লে পৃথিবীবাসী শান্তির নিঃশ্বাস নিত। দুর্বলের বুকে কেউ লাথি মারতে পারত না। বিনা বিচারে কেউ বছরের পর বছর জেল খাটত না। ফিলিস্তীনীদের গায়ে আঘাত হানা ঐ হাত উদ্যত হওয়ার আগেই ভেঙ্গে যেত। কিন্তু হায়! সেদিন যে কত দূর! সেদিনের অপেক্ষার প্রহরই আমরা গুণছি প্রতিনিয়ত।

**ইয়ামান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর মন্তব্য :**

রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْإِيْمَانُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ 'নিশ্চয় ঈমান ইয়ামানে এবং হিকমাহ হচ্ছে ইয়ামানী' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহে, মিশকাত হা/৬২৫৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا وَفِى يَمَنِنَا 'হে আল্লাহ! আমাদের শামে বরকত দিন এবং ইয়ামানে বরকত দিন' *(ছহীহ বুখারী হা/১০৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, وَالْأَمَانَةُ فِى الْأَزْدِ 'আমানতদারীতা হচ্ছে ইয়ামানে' *(তিরমিযী হা/৩৯৩৬; মিশকাত হা/৫৯৯৩; সনদ ছহীহ)*।

**ইয়ামানের পরিচয় :**

ইয়ামান দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে ওমান ও সঊদী আরবের মধ্যখানে অবস্থিত। দেশটি লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরকে সংযোগকারী বাব-এল-মান্দের প্রণালীর মুখে অবস্থিত। লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পেরিম দ্বীপ এবং এডেন উপসাগরে অবস্থিত সোকোত্রা দ্বীপকে গণনায় ধরে ইয়ামানের মোট আয়তন ৫,২৭,৯৭০ বর্গকিলোমিটার। ইয়ামানের স্থল সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ১,৭৪৬ কিলোমিটার।
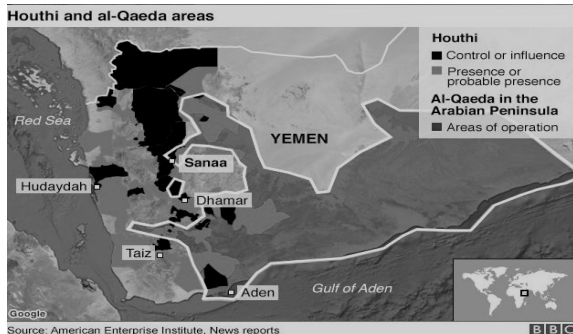
১৯৯০ সালে ইয়ামান আরব প্রজাতন্ত্র (উত্তর ইয়ামান) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়ামান (দক্ষিণ ইয়েমেন) দেশ দু'টিকে একত্রিত করে ইয়ামান প্রজাতন্ত্র গঠন করা হয়। ১৯৯০ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত এদেশ দু'টি আলাদা রাষ্ট্র 'উত্তর ইয়ামান' এবং 'দক্ষিণ ইয়ামান' নামে বিভক্ত ছিল। উভয় দেশ একত্রিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ইয়ামান গণপ্রজাতন্ত্রী এবং দক্ষিণ ইয়ামান কমিউনিস্ট শাসনাধীনে ছিল। উল্লেখ্য যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে উত্তর ইয়ামানে প্রথম জনবসতি গড়ে ওঠে।

**হূছীর পরিচয় :**

শী'আদের ইছনা 'আশারা ফের্কার একটি ফের্কা হল 'জায়দিয়া'। তাদের একটি অংশ হচ্ছে 'জারূদী'। হূছীরা এই জারূদী তথা জারূদ বিন যিয়াদ বিন মুনযির আল-কূফীর (মৃঃ ১৬০ হিঃ) দিকে নিজেদেরকে সম্বন্ধিত করে থাকে। জায়দিয়াদের সাথে তাদের মতদ্বন্দ্ব মূলতঃ শী'আদের বিখ্যাত ইমামাতের মাসআলার ধরণ ও প্রকৃতি নিয়ে।

নাম : তাদের দল 'আনছারুল্লাহ' ও 'শাবাব মুসলিম' নামে পরিচিত। স্লোগান : আল্লাহু মহান! আমেরিকার জন্য মৃত্যু! ইসরাঈলের জন্য মৃত্যু! ইসলামের জন্য সাহায্য! প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৯৪ ইং। ২০০৪ সাল থেকে তারা সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছে। প্রতিষ্ঠাতা : হোসাঈন আল-হূছী।

**যায়দী বনাম ইছনা আশারা :**

শী'আদের প্রধান দু'টি গ্রুপ হচ্ছে ইছনা আশারা ও যায়দী। ইমামাতের মাসাআলা নিয়ে তাদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। ইছনা আশারা শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বার। শী'আদের ইছনা আশারা গ্রুপ ১২ জন ইমামে বিশ্বাস করে। তন্মধ্যে ১১ জন ইতিমধ্যেই দুনিয়াতে এসেছেন। আরেক জন তথা ১২ তম ইমাম 'সুররা মান রাআ' পাহাড়ে লুকিয়ে রয়েছে। যখন সময় হবে তখন তিনি বের হবেন। এই ১২ তম ইমামই শী'আদের ইমাম মাহদী। যখন এই ১২তম নেতা বের হবেন তখন আলী (রাঃ) মেঘের উপর থেকে তার আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিবেন। ইরানের শী'আরা এই ইছনা আশারা ফের্কার অর্ন্তভুক্ত। তাদের আরেক নাম জা'ফারি শী'আ। ইছনা আশারা শী'আরা ছাহাবীদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত বিদ্বেষ রাখে। বিশেষ করে আবুবকর, ওমর ও আয়েশা (রাঃ) তাদের চোখের বিষ।

উল্লেখ্য যে, শী'আদের মোট তিনটা স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের শী'আরা আলী (রাঃ)-কে প্রভু মনে করে। যেমন সিরিয়ার নুসাইরী শী'আ বা বাশার আল-আসাদের সম্প্রদায়। এদেরকে বলা হয় 'আলাবী শী'আ। যারা আলী (রাঃ)-কে প্রভু

মনে করে না, কিন্তু তাকেই একমাত্র হক্ব ইমাম মনে করে এবং আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মনে করে বলে তাদেরকে রাফেযী বলা হয়। ইরানের ইছনা আশারা শী'আরা এই পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত। সর্বশেষ স্তর হচ্ছে যায়দী শী'আ, তারা আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে পথভ্রষ্ট মনে করে না বা তাদের বিষয়ে বিদ্বেষও পোষণ করে না, কিন্তু তারা আলী (রাঃ)-কে তাঁদের তিনজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অবশ্য মু'তা বিবাহ, তাকিয়া বা ধোঁকা দেয়া ইত্যাদি মাসাআলাতে সবাই একমত।

যায়দী শী'আদের সাথে ইছনা আশারা শী'আদের মূল দ্বন্দ্ব হচ্ছে ইমামতের প্রশ্ন নিয়ে। যেখানে ইছনা আশারাগণ ১২ জন নেতায় বিশ্বাস করে, সেখানে যায়দীরা তা বিশ্বাস করে না। ইছনা আশারাগণ একজন ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় আছে, কিন্তু যায়দীগণ এই ১২তম ইমাম ইমাম মাহদীতে বিশ্বাস করে না। এমনকি এজন্য অনেক ইছনা আশারা ফের্কার আলেম যায়দীদের কাফের বলে থাকে। যায়দীরা হুসাইন (রাঃ)-এর পৌত্র যায়েদ বিন আলীকে নিজেদের ইমাম মনে করে। যায়েদ বিন আলীর নামের দিকে নিসবাত করে তাদেরকে যায়দী বলা হয়। যায়েদ বিন আলী ১২২ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। যারা সেই যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তার এই বিদ্রোহকে সমর্থন দেয় তারাই যায়দী নামে পরিচিত।

**যায়দী বনাম হুছী-জারূদী :**

হুছীগণ যায়দী শী'আ হলেও তাদের মাঝে এবং সাধারণ যায়দীদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। মূলতঃ হুছীরা যায়দী শী'আর একটা গ্রুপ, যারা জারূদীদের অর্ন্তভুক্ত। তারা নিজেদেরকে জারূদ বিন যিয়াদ বিন মুনযির আল-কূফীর (মৃ. ১৬০ হি.) দিকে নিজেদেরকে সম্বন্ধিত করে থাকে। এই জারূদ বিন যিয়াদ সম্পর্কে ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, সে মিথ্যুক, আল্লাহর শত্রু।[৬৭] ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন, সে রাফেযী শী'আ। রাসূলের ছাহাবীদের দোষ-ত্রুটির বিষয়ে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করত।[৬৮] আল্লামা শহরাস্তানী 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে জারূদীদের বিষয়ে বলেন, তারা তিন খলীফার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে গালি-গালাজ করার ক্ষেত্রে ইছনা আশারাদের মতই।[৬৯] অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, জারূদীগণ শী'আদের একটা স্বাধীন ফের্কা। অবশ্য ইমামতের মাসাআলাতে তারা ইরানের ইছনা আশারা ফের্কার বিপরীতে যায়দী ফের্কার মতবাদে বিশ্বাসী।

**হুছী-জারূদীদের আক্বীদা :**

**(এক) অবুবকর ও ওমর (রাঃ) পথভ্রষ্ট :** হুছীদের অন্যতম আক্বীদা হচ্ছে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) পথভ্রষ্ট। হুসাইন আল-হুছী বলেন, انهما اي الشيخين أبا بكر و عمر مخطئون عاصون ضالون– 'নিশ্চয় আবুবকর ও ওমর ভুল করেছেন তারা নাফারমান ও পথভ্রষ্ট'। (নাঊযুবিল্লাহ)।[৭০]

**(দুই) আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত নেয়া ছিল চরম ভুল :** হুছাইন আল-হুছী আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত নেয়ার বিষয়ে বলেন,

شر تلك البيعة اي البيعة لابي بكر في سقيفة بني ساعدة ما زال الي الان — و ما زلنا نحن المسلمين نعاني من اثارها الي الان–

'সাকিফায়ে বানি সা'আদার সেই বায়'আতের খারাপ আজো রয়েছে। আমরা মুসলিমরা আজও সেই ভ্রান্ত বায়'আতের মাসুল দিচ্ছি'।[৭১]

**(তিন) সবচেয়ে বড় অপরাধী ওমর (রাঃ) :** হুসাইন আল-হুছী ওমর (রাঃ)-এর বিষয়ে বলেন,

كل ظلم وقع لهذه الامة و كل معاناة وقعت الامة فيها المسئول عنها ابو بكر و عمر و عثمان و عمر بالذات لأنه المهندس للعملية كلها هو المرتب للعملية كلها فيما يتعلق بابي بكر–

'মুসলিম উম্মাহ্র উপর আজ অবধি যত অত্যাচার ও নির্যাতন হয়েছে ও হচ্ছে, তার জন্য আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ) দায়ী। সবচেয়ে বেশী দায়ী ওমর (রাঃ)। কেননা রাসূলের মৃত্যুর পর থেকে আবুবকর (রাঃ)-এর আমলে যা কিছু হয়েছে তার সবকিছুর মূল কারিগর ও মূল ষড়যন্ত্রকারী ছিল ওমর (রাঃ)'।[৭২]

সুধী পাঠক! ইরানের ইছনা আশারা এবং ইয়ামানের হুছীগণ মাযহাবগতভাবে হুবহু এক নয়। বরং তাদের মাঝে মাসাআলাগত ইখতিলাফ রয়েছে। এদিক থেকে ইয়ামানের যুদ্ধকে সম্পূর্ণ মাযহাবী রূপ দেয়া যায় না। অনেক বিশ্লেষকদের মতে ইয়ামানের যুদ্ধ একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ। যদিও মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই এই রাজনৈতিক যুদ্ধটি পরিচালিত হচ্ছে। যার প্রভাব অবশ্যই সুন্নী ও শী'আ মাযহাবের উপর পড়বে। যেমনভাবে সিরিয়ার বাশার আল-আসাদ মাযহাবগতভাবে ইরানের ইছনা আশারা ফের্কার অর্ন্তভুক্ত না হলেও ইরান তাকে সমর্থন দিয়ে আসছে। তেমনিভাবে হুছীরা সম্পূর্ণরূপে তাদের মাযহাবী না হলেও ইরান তাদেরকে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। সিরিয়া এবং ইয়ামানের শী'আরা ইছনা আশারা শী'আ না হওয়ার পরেও ইরান তাদেরকে সহযোগিতা করে আসার অন্যতম কারণ হচ্ছে, এই সহযোগিতার আড়ালে তারা নিজেদের ইছনা আশারা ফের্কার প্রচার ও প্রসার ইয়ামান ও সিরিয়ার মাটিতে করছে। পাশাপাশি সুন্নীদের বিরুদ্ধে সকল শী'আদের একত্রিত করার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাছিল করতে চাচ্ছে। তাইতো বলতে হয়, শী'আদের মধ্যে যতই ইখতিলাফ থাক সুন্নীদের বিরোধিতায় তারা একাট্টা।

---

৬৭. ইবনু আদী, আল কামিল ফিয যুয়াফা, ৩/১৮৯ পৃঃ।
৬৮. ইবনু হিব্বান, আল মাজরূহীন, ১/১৯৭ পৃঃ।
৬৯. আল্লামা শহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৪ হি.) ১/১৫৩ পৃঃ।

৭০. হুসাইন আল হুছী, দুরুসুম মিন হাদইল কুরআন, পৃঃ ২৩।
৭১. মাসউলিইয়্যাতু আহলিল বায়ত, পৃঃ ১১।
৭২. দুরুসুম মিন হাদইল কুরআন, সূরা মায়িদার দারস দ্রষ্টব্য।

**উত্থানের কারণ :**

শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদেঈ আল-খাল্লালী ১৯৭৯ সালের দিকে ইয়ামানের ছা'দা শহরের নিকটবর্তী দাম্মাজ নামক এলাকায় একটি সালাফী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই ছা'দা শহরটি ছিল হুছী শী'আদের ঘাঁটি। শায়খ মুক্ববিলের দাওয়াতে এক সময় সেখানে হাযার ছাত্রের সমাহার হয়। 'দারুল হাদীছ দাম্মাজ' একটি ব্যতিক্রমধর্মী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে রূপলাভ করে। ছাত্ররা আশেপাশের অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দাওয়াত প্রচার করত। তারা ছূফী শী'আদের মূলোৎপাটনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। শায়খ মুক্ববিলের এই দাওয়াত থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাছিল করার জন্য আলী আব্দুল্লাহ ছালেহ সেখানকার শী'আদের উৎখাত করার চিন্তা করে। এমনিতেই শায়খ মুক্ববিলের দাওয়াতের জন্য তারা রাগান্বিত ছিল। সর্বোপরি সরকারের মনোভাব বুঝতে পেরে তারা অস্ত্র সহ ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবার আগে তারা তাদের সকল নষ্টের মূল হাযার হাযার ছাত্রের পদচারণায় মুখরিত 'দারুল হাদীছ দাম্মাজ'-কে ধ্বংস করে দেয় এবং শিক্ষক ছাত্রদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। আল্লাহুল মুসতা'আন। পরবর্তীতে তারা এই সংগ্রামকে সরাসরি সরকার বিরোধী সংগ্রাম হিসাবে পরিচালিত করে। এ সময় ইরান তার বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হুছীদের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করে। সঊদী আরব তার নিজস্ব ভূ-রাজনীতির কারণে ইয়ামানের সরকারকে হুছীদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করে এবং যুদ্ধের পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

**বর্তমান অবস্থা :**

শী'আ রাষ্ট্র ইরানের সহযোগিতা হুছীদেরকে দিন দিন প্রতিশোধ পরায়ণ করে তুলে। তারা ইরানের সহযোগিতা পেয়ে ধীরে ধীরে রাজধানী ছান'আর দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। এক পর্যায়ে তারা ইয়ামানের সরকারকে উৎখাত করে। ইয়ামান সরকার তার আরব বন্ধুদের কাছে সহযোগিতার হাত পাতে। ফলতঃ আরব কান্ট্রিগুলো যরূরী ভিত্তিতে সঊদী আরবের নেতৃত্বে হুছীদের

অস্ত্রাগার ও স্থাপনার উপর হামলা চালাতে থাকে। হুছীরাও জবাবে সঊদীর নাযরান সীমান্ত এলাকায় মর্টার হামলা চালাতে থাকে। অল্প দিনের ব্যবধানে সঊদী আরবের মাটিতে মসজিদ সহ বিভিন্ন জায়গায় আত্মঘাতী হামলা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো হুছীদেরই কাজ। যদিও এই হামলাগুলোর অধিকাংশই হয়েছে শী'আ অধ্যুষিত এলাকাতে। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার রাজনীতি তো বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে স্বীকৃত কথা।

**ইরান বনাম আমেরিকা :**

ইরানের পরিকল্পনা হল জেদ্দার উপর দিয়ে ইরাক-ইরানের মাঝে সংযোগ সড়ক নিয়ে যাবে। শী'আদের আধ্যাত্মিক রাজধানী হবে বাগদাদ। এই জন্য তাদেরকে ইয়ামান হয়ে মক্কা-মদীনা-জেদ্দা দখলে নেয়া দরকার। কেননা ইরাক নিয়ে তাদের কোনও টেনশন নেই। তাদের শত্রু সুন্নী সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে আমেরিকা, যারা তাদের বাস্তব বন্ধু ও বাহ্যিকভাবে চরম শত্রু। অন্যদিকে ফিলিস্তীনও তাদের বাহ্যিক শত্রু, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইসরাঈলের দখলে আছে। লেবাননে আছে তাদের মদদপুষ্ট হিজবুল্লাহ। এখন শুধু দরকার সঊদী আরব। আর সঊদীকে তটস্থ রাখার জন্য বা দুর্বল করার জন্য তার প্রতিবেশীদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত হচ্ছে ইয়ামানের জায়দী শী'আ গোত্র হুছী। তাদেরকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে চায় ইরান।

সুধী পাঠক! সঊদী আরব এতদিন আমেরিকা নিয়ে অনেকটা ঘোরের মধ্যে ছিল। কিন্তু ইয়ামানের এই সমস্যায় যথোপযুক্ত সহযোগিতা না পাওয়ায় আমেরিকা সম্পর্কে সঊদী আরবের ধারণা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। তাদের পররাষ্ট্রনীতিতেও পরিবর্তন আসতে পারে। আমেরিকা ইরানকে পারমাণবিক বোম তৈরী করতে দিবে না ইত্যাদি এগুলো সবই তার বাহ্যিক তর্জন-গর্জন মাত্র। বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টা। বরং প্রয়োজন পড়লে শুধু পারমাণবিক বোমা কেন, আমেরিকা ইরানের হাতে ইসরাঈলের মত অস্ত্র ভাণ্ডার তুলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। আমেরিকা যদি ইরানের শত্রুই হবে, তাহ'লে এতদিন একবারও কেন ইরানে হামলা করল না? ড্রোন হামলা কী শুধু পাকিস্তানের জন্য খাছ। সন্ত্রাসী কী শুধু বিন লাদেন আর মোল্লা ওমর? হাসান নাছরুল্লাহ কী সন্ত্রাসী নয়? এক মালালার জন্য তাদের এত দরদ কেন? ঐ রকম হাযারো মালালা ফিলিস্তীনের প্রতিটি বাড়ীতে পাওয়া যাবে। কিন্তু আসল মালালাদের গুলি লাগলে তারা বেঁচে থাকে না, মারা যায়! তাদের একটাই অপরাধ তাদের যারা মারছে তারা যে ইহূদী, তারা যে খ্রীষ্টান। ইহূদী খ্রীষ্টান হলে সব মাফ। যদি তাদের জায়গায় একজন করে ইহূদী মালালা মারা যেত তাহ'লে যে কী হ'ত তা মানব চক্ষু কল্পনাও করতে পারে না।

আর মুসলিমদের কথা কি বলব? টিভির পর্দায় 'বাজরাঙ্গী ভাইজান' দেখলে তাদের চোখ দিয়ে পানি পড়ে কিন্তু এই রকম হাযারো বাজরাঙ্গীর ঘটনা যে তাদের চারপাশে ঘটছে, তা তারা দেখেও না দেখার ভান করে। বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে পার্থক্য করার কমনসেন্সটুকু তাদের নেই। বাস্তব ঘটনার জন্য চোখের পানি ফেলার ফুরসত তো দূরে থাক, বাস্তব ঘটনা জানার আগ্রহও তাদের থাকে না। যতসব মানব দরদী ও মানবতা জেগে উঠে  কাল্পনিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। হায়রে হতভাগা মুসলিম!

**পাকিস্তান সমাচার :**

ইয়ামান হামলায় পাকিস্তান সউদী আরবকে সহযোগিতা করছে কি-না এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা-লেখি হয়েছে। সংবাদ বিশ্লেষকরা এই নিয়ে কথা ও কলমের অনেক ফুল ঝুরি ঝরিয়েছেন।

১৯৬৭ সালের কথা। আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ। ইসরাঈলে হামলা চালাবার জন্য সিরিয়ার আকাশে একটি বোমারু বিমান উড়ছে। ইসরাঈলের সীমান্ত থেকে বিমানটিকে ভূপাতিত করার জন্য সকল রকমের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বিমান চালক এত দক্ষতার সাথে বিমান চালাচ্ছে যে, তাদের সকল নিশানা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। একপর্যায়ে ইসরাঈলের সকলেই নিশ্চিতভাবে ধারণা করল যে, এই বিমানের পাইলট কোনও আরব নয় বরং অবশ্যই পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর সদস্য।

এই যুদ্ধের প্রায় ২৫ বছর পর অনানুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান স্বীকার করে যে, তাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরাই সে সময় ইসরাঈলের বিরুদ্ধে আরব বন্ধুদের সাথে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সকল বিবৃতি স্পষ্ট করছিল এই যুদ্ধের সাথে পাকিস্তান বিন্দুমাত্র শরীক নেই।

সুতরাং আজকেও বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে পাকিস্তানের বিবৃতি সব সময় হবে তারা ইয়ামানের সাথে যুদ্ধে কোনও পক্ষের সাথেই নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সউদী আরবকে সহযোগিতা না করার কথা পাকিস্তান কল্পনাও করতে পারে না। আর যদি করে থাকে তাহ'লে তা হবে ঐতিহাসিক ভুল সিদ্ধান্ত। নওয়াজ শরীফ তো সউদী বাদশাহদের ঘরের লোক। পাকিস্তানের পারমাণবিক বোম বানানোর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করেছে সউদী আরব।

**বাদশাহ সালমান ও তার ছেলে মুহাম্মাদ :**

ইয়ামান ও সউদী আরবের ঘটনায় সবচেয়ে আলোচিত নাম হচ্ছে বাদশাহ সালমান ও তার ছেলে মুহাম্মাদ। ক্ষমতায় এসেই

সকল সরকারী কর্মচারীদের দুই মাসের বেতনের সমান টাকা তার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসাবে দেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে ইসলামের আইন-কানূন রক্ষার অন্যতম মাধ্যম 'আল-আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার' সংস্থার প্রধান করেন। ফলে বহুদিন থেকে ধীরে ধীরে দুর্বল হ'তে থাকা এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হালে পানি পায়। বারাক ওবামাকে বিমান বন্দরে ছেড়ে ছালাত আদায় করতে গিয়ে ক্ষমতার প্রথমদিকেই ভাল হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী উত্তরসূরী নির্বাচনেও তিনি আগের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে নিজের ছেলেকে স্থলাভিষিক্ত করেন। অবশ্য মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে যে, তার ভাই নিজে থেকেই ইস্তফা দিয়েছেন।

তার সবচেয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে হুছীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সাথে সাথেই লাইম লাইটে আসেন তার ছেলে। ধারণা করা হয় তার ছেলের পরামর্শেই তিনি এই রিস্কি ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। এমনকি প্রথম অভিযানে তার ছেলে মুহাম্মাদ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। বিশ্লেষকদের ধারণা মতে যদি সউদী আরব এই হামলাতে সফল হয়, তাহ'লে বাদশাহ সালমানের ছেলে মুহাম্মাদের ভবিষ্যৎ ক্ষমতা আরো শক্তিশালী হবে। আর যদি এই হামলা সউদীদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে বাদশাহ সালমানের ছেলে মুহাম্মাদের রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। তবে তিনি অল্প সময়ে সউদী তরুণদের মাঝে ভালই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে সউদী আরবের অনেক ভুল-ত্রুটির চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে দেখেছি। বিশেষ করে আরব বসন্তের সময়ের লেখালেখি এবং মিসর, সিরিয়া ও লিবিয়ার ঘটনাবলির বাস্তবতাতে মনে হচ্ছিল হোসনী মোবারককে যেমন অধিকাংশ মিসরী পসন্দ করে না, মু'আম্মার আল-গাদ্দাফীকে যেমন অধিকাংশ লিবিয়ান পসন্দ করে না। ঠিক তেমনি মনে হয় সউদী বাদশাহকে তার দেশের কেউ পসন্দ করে না। তাইতো তাদের দেশেও বসন্তের বিপ্লবের হাওয়া লাগার সম্ভাবনা খুব জোরেশোরেই গুঞ্জন তুলেছিল মিডিয়াগুলো। কিন্তু সউদে আরবে পদার্পণের পর সংক্ষিপ্ত সময়ের অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে যে, দেশের প্রায় ৮০% লোক তাদের বাদশাহকে এবং বাদশাহ্র পরিবারকে মন থেকে সম্মান করে এবং ভালবাসে। মিডিয়া যে মানুষের মাথায় কত রকম মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ও কল্পনাপ্রসূত বিষয় পেশ করে, সেটাকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে বাস্তবে নিয়ে আসার চেষ্টা করে, তা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য হ'তে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সউদী আরবের এখন চোখ খুলার সময় এসেছে। দেরীতে হলেও সউদী আরবের এখন বোধদয়ের সময় এসেছে। ইসলামের স্বার্থে সউদী আরবের উচিত আরো দূরদর্শী হওয়া। ইরান যেমন শী'আ গ্রুপগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে, তেমনি সউদী আরবের উচিত বিভিন্ন দেশের সুন্নী গ্রুপগুলোকে নির্দ্বিধায় সহযোগিতা করা। সুন্নী গ্রুপগুলোর মাঝের দূরত্ব কমিয়ে আনতে ভূমিকা রাখা। অলসতা আর বিলাসিতা অনেক হয়েছে। এখন মক্কা-মদীনাবাসীর গর্জে উঠার দিন। এখন একটা ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে তার খেসারত দিতে হবে বহুদিন। আল্লাহ্র কাছে দো'আ করছি, হে আল্লাহ! আপনি মুসলিম উম্মাহকে হেফাযত করুন-আমীন!!

*[লেখক : শিক্ষার্থী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব]*

# কুরআনের ভুল খুঁজতে গিয়ে ইসলামের ছায়াতলে ডক্টর গ্যারি মিলার

ড. গ্যারি মিলার ছিলেন কানাডার একজন খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারক। তিনি পবিত্র কুরআনের ভুল খুঁজার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে ইসলাম ও কুরআন বিরোধী প্রচারণা চালানো সহজ হয়। কিন্তু ফল হয়েছিল বিপরীত। তিনি বলেন, আমি কোন একদিন কুরআন সংগ্রহ করে তা পড়া শুরু করলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম কুরআন নাযিল হয়েছিল আরবের মরুচারীদের মধ্যে। তাই এতে নিশ্চয় মরুভূমি সম্পর্কে কথা থাকবে। কুরআন নাযিল হয়েছিল ১৪০০ বছর আগে। তাই খুব সহজেই এতে অনেক ভুল খুঁজে পাব ও সেসব ভুল মুসলিমদের সামনে তুলে ধরব বলে সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা ধরে কুরআন পড়ার পরে বুঝলাম আমার এসব ধারণা ঠিক নয়, বরং এমন একটা গ্রন্থে অনেক আকর্ষণীয় তথ্য পেলাম। বিশেষ করে সূরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতটি আমাকে গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত করে। সেখানে আল্লাহ বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا 'এরা কী লক্ষ্য করে না কুরআনের প্রতি? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে নাযিল হ'ত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত'। খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারক গ্যারি মিলার এভাবে ইসলামের দোষ খুঁজতে গিয়ে মুসলিম হয়ে যান।

তিনি বলেছেন, 'আমি খুব বিস্মিত হয়েছি যে, কুরআনে ঈসা (আঃ)-এর মাতা মারিয়ামের নামে একটি বড় পরিপূর্ণ সূরা রয়েছে। আর এ সূরায় তাঁর এত ব্যাপক প্রশংসা ও সম্মান করা হয়েছে যে, এত প্রশংসা বাইবেলেও দেখা যায় না। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম মাত্র ৫ বার এসেছে। কিন্তু ঈসা (আঃ)-এর নাম এসেছে ২৫ বার। আর এ বিষয়টি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে আমার ওপর ব্যাপক প্রভাব রেখেছে'।

**প্রাসঙ্গিক আলোচনা :**

ইসলাম মানুষের জীবনকে করে লক্ষ্যপূর্ণ। কারণ এ ধর্মের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের রয়েছে সুনির্দিষ্ট অর্থ ও লক্ষ্য। কিন্তু পশ্চিমা সরকারগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তারা মুসলিমদেরকে পাশ্চাত্যের জন্য বিপজ্জনক বলে তুলে ধরছে। আর এই অজুহাত দেখিয়ে পশ্চিমা সমাজে মুসলিমদের উপর আরোপ করা হয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা। ইউরোপ-আমেরিকার ক্ষমতাসীন সরকার ও ইসলাম-বিদ্বেষী দল বা সংস্থাগুলো এভাবে মুসলিম ও ইসলামের উপর আঘাত হানার পাশাপাশি নিজেদেরকে পশ্চিমা সভ্যতা এবং পশ্চিমা জনগণের সমর্থক হিসাবে জাহির করার পাশাপাশি জনগণকে বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করছেন।

পাশ্চাত্যে ইসলামের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব ক্রমেই বাড়তে থাকায় ইসলাম বিরোধী মহলগুলোর ইসলাম-বিদ্বেষী তৎপরতাও জোরদার হয়েছে। বর্তমানে মুসলিমদের নিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যম ও জনমত ব্যাপক বিতর্কে মেতে রয়েছে। পাশ্চাত্যের উগ্র লেখক ফিলিপ রনডু বলেছেন, 'মুসলিমরা হচ্ছে বিস্ফোরণের বোমার মত এবং ইসলাম বহু মানুষকে, বিশেষ করে ইউরোপের বহু মানুষকে আকৃষ্ট করছে'।

বহুল প্রচারিত এক টাইম ম্যাগাজিনগুলোতে ইউরোপে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে 'ইউরোপের পরিচিতির সংকট' বলে অভিহিত করেছে। ২০১০ সালের শেষের দিকে সুইজারল্যান্ডে মসজিদের মিনার নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞার আইন চালু করার লক্ষ্যে এক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই পদক্ষেপের মূল পরিকল্পনাকারী ছিল 'সুইস পিপলস পার্টি' নামের একটি উগ্র খ্রিষ্টানপন্থী দল। মুসলিমদের ব্যাপারে আতঙ্ক সৃষ্টি করাই ছিল এই পদক্ষেপের লক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত এই আইন পাশ করতে সফল হয় দলটি। দলটির পক্ষ থেকে সর্ব প্রথম এই আইন চাপিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সুইস রাজনীতিবিদ ড্যানিয়েল স্ট্রিচ। তিনি পুরো সুইজারল্যান্ডে ইসলাম-বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে দেন এবং জনগণের মধ্যে ইসলাম-অবমাননার বীজ বপন করেন। ফলে সুইস জনগণ মসজিদের মিনার নির্মাণের বিরোধী হয়ে পড়ে এবং মিনার নির্মাণ নিষিদ্ধ হয়।

কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম পাশ্চাত্যে পূর্বের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে। ফলে এক পর্যায়ে তিনি ইসলামের যৌক্তিক শিক্ষাগুলো ও পবিত্র কুরআন নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন এবং ইসলামের অকাট্য যুক্তি ও বাস্তবতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এভাবেই সুইজারল্যান্ডে ইসলাম-বিদ্বেষী আন্দোলনের প্রধান নেতা সুইস রাজনীতিবিদ ড্যানিয়েল স্ট্রিচ নিজেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

ড্যানিয়েল স্ট্রিচ এখন একজন সামরিক প্রশিক্ষক এবং পৌরসভার সদস্য ও অঙ্গীকারাবদ্ধ মুসলিম। তিনি নিয়মিত মসজিদে আসেন, কুরআন অধ্যয়ন করেন ও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'ইসলাম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর যৌক্তিক জবাব দেয়, যা আমি কখনও খ্রিষ্ট ধর্মে খুঁজে পাইনি। আমি ইসলামের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি জীবনের বাস্তবতা'।

ড্যানিয়েল স্ট্রিচ এখন তার অতীতের কাজের জন্য লজ্জিত। তিনি সুইজারল্যান্ডে ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন। দেশটিতে এখন ৪টি মসজিদ সক্রিয় রয়েছে। ড্যানিয়েলের স্বপ্নের মসজিদটি নির্মিত হ'লে সুইজারল্যান্ডে মসজিদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫টিতে। তিনি দেশটিতে ইসলাম বিরোধী যে তৎপরতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এভাবেই তার ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। ড্যানিয়েল এখন ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আন্দোলন গড়ে তোলারও চেষ্টা করছেন।

'ওপিআই' নামের একটি ইসলামী সংস্থার প্রধান আবদুল মজিদ আদলি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ইউরোপের জনগণ ইসলাম সম্পর্কে জানতে ব্যাপকভাবে আগ্রহী। তাদের অনেকেই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করতে চান। ঠিক যেভাবে সুইজারল্যান্ডের ড্যানিয়েল এ পথে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ইসলামের মোকাবেলা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের সঙ্গে খুব কঠোর আচরণ করবেন। কিন্তু এর ফল হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত'।

ড্যানিয়েল বলেন, 'মহান ধর্ম ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, যারাই এর মোকাবেলা করতে চায় তাদেরকে এই পবিত্র ধর্ম চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার আহ্বান জানায়। ফলে ইসলামের খুঁত বের করার চেষ্টা করতে গিয়ে তারা এ যে খাঁটি আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম. তা বাস্তবতা বুঝতে পারে। কারণ ইসলাম মানুষের প্রকৃতির চাহিদার আলোকে প্রণীত হয়েছে। সত্য অনুসন্ধানের ইচ্ছা নিয়ে যারাই ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করেন তারা এই আসমানী ধর্মের সত্যতা অস্বীকার করতে পারেন না।

বিশিষ্ট ইংরেজ গবেষক জন ডেভেনপোর্ট বলেছেন, 'কুরআন ভুল-ত্রুটিমুক্ত হওয়ায় এতে কোন ছোটখাট সংশোধনেরও দরকার নেই। তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন পড়ার পরও সামান্যতম বিরক্তিও সৃষ্টি হবে না কারো মধ্যে। বছরের পর বছর ধরে পাদ্রীরা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের বাস্তবতা ও মহত্ত্ব থেকে দূরে রেখেছেন। কিন্তু আমরা যতই জ্ঞানের পথে এগুচ্ছি ততই অজ্ঞতা ও অযৌক্তিক গোঁড়ামির পর্দা মুছে যাচ্ছে। শিগগিরই এ মহাগ্রন্থ, যার প্রশংসা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য কারো নেই। বিশ্বকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং বিশ্বের উপর গভীর প্রভাব ফেলবে ও শেষ পর্যন্ত বিশ্বের মানুষের চিন্তা-চেতনার প্রধান অক্ষে পরিণত হবে'।

# লেক-পাহাড়ের রাঙ্গামাটি

**(পূর্ব প্রকাশিতের পর)**

**রঙরাং পাহাড় চূড়ায় আরোহণ :**

এবার আমরা সহসা পাহাড়ে ওঠার মস্ত এক কর্মসূচি হাতে নিয়ে ফেললাম। বালুখালী হ্রদে গোসল করার সময়ই সিদ্ধান্ত নিলাম শুভলং দ্বীপের পাশের পাহাড়টির ওপরে উঠার। নৌকা থামল শুভলং বাজার ঘাটে। অনুমতির জন্য সোজা চলে গেলাম ক্যাম্পে। কিন্তু কোনো অনুমতি লাগে না দেখে সফর সঙ্গীদের পাহাড়ের ওঠার উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেল। কোমর বেঁধে শুরু হলো পাহাড় বেয়ে ওঠার পালা।

বেলা বেশ পড়ে গেছে। বাতাসের বেগ আছে যথেষ্ট। শরীরের ভেজা কাপড় আর বদলানোর সময় হলো না। অবশ্য ভেজা কাপড়ে কোনো ক্ষতি হলো না। বরং ভিজা কাপড় গায়ের ঘাম শুষে নিল। দূর থেকে ভেবেছিলাম এক দৌড় দিয়ে হয়তো উঠা যাবে চূড়ায়। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, গরমে অনেকেরই জিহ্বা বের হয়ে গেল তপ্ত মহিষের মত। পাহাড়ে ওঠার পথটি যথেষ্ট খাড়া। ট্রেকিং এর জগতে দলের সবাই নতুন। প্রায় বিশ মিনিট লেগে গেল পাহাড় চূড়ায় উঠতে।

রঙরাং পাহাড় চূড়ায় পুলিশের ক্যাম্প, আর পাদদেশে সেনাবাহিনীর। চূড়ায় স্থাপিত টিএন্ডটির টাওয়ার। নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আছেন বেশ কিছু পুলিশ সদস্য। টিএন্ডটি টাওয়ার থাকায় অনেকে এটিকে 'টিএন্ডটি পাহাড়' নামেও চিনে থাকেন। তবে এর আদি নাম 'রঙরাং টিলা'। পাহাড় চূড়া থেকে কর্ণফুলি দেখতে অসাধারণ! পূর্ব দিকে পাহাড়ের নীচে ছোট্ট দ্বীপের ওপর শুভলং বাজার যেন নিঃশ্বাস ফেলছে পানির ওপর। আগেই জানানো হয়েছে, কাসালং আর কর্ণফুলি নদীর স্রোত

মিলিত হয়েছে শুভলং এ এসে। পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে চোখের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে উত্তর-দক্ষিণে কাপ্তাই হ্রদের সুবিস্তৃত জলরাশি এবং দূরে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি।

এই পাহাড় চিরে বয়ে চলা কর্ণফুলির দু'পাশে এক সময় ছিল রঙরাং নামক এক প্রজাতির পাখির বসবাস। ক্রমেই নদীতে ইঞ্জিন চালিত নৌকা ও ট্রলারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ধনেশের মতো দেখতে এ সব পাখি আর নিরাপদ মনে করল না নিজেদের আদি আবাসকে। গহীন পাহাড়ে তাদের এখন আশ্রয়। রঙরাং পাখির ডাকও শোনা যায় না এখন। তবে পাহাড়িদের কাছে এখনো পাহাড়টি রঙরাং টিলা নামে পরিচিত।

পাহাড়ের চূড়ায় কাঁঠাল, আমসহ নানান গাছের সমাহার। পাদদেশে গাছপালা আর জঙ্গল। সে জঙ্গলে আছে বানরের লুকোচুরি খেলা। তবে বানরের পাল কাউকে বিরক্ত করে না। পাহাড় চূড়ায় উঠে চারপাশের সৌন্দর্যে ডুবে গিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে ভুলে বসলাম ট্রেকিং করার কষ্ট। যদিও পাহাড়ে ওঠার কাজ যথেষ্ট পরিশ্রমের। তবে চূড়ায় উঠার পর কষ্ট আর থাকে না। ট্রেকিং এর সময় মনোয়ার ও তানভীর ভাই বেশ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন। ক্যাম্পে পানি চাইতে গেলে কোনো এক পুলিশ সদস্য মজার ছলে বললেন, 'আম-কাঁঠাল যা ইচ্ছা খান, পানি চায়েন না ভাই'। আঠারোশ' ষাট ফুট উচ্চতার এ পাহাড় চূড়ায় পানির ব্যবস্থপনা সত্যিই কঠিন।

গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে রাখা হয়েছে নীচে। কাঁঠালগুলো যে পাকা বুঝতে অসুবিধা হলো না। রাঙ্গামাটিতে বৈশাখ মাসের শুরুতে পাকা কাঁঠাল পাওয়া যায়। পাহাড়ি কাঁঠালের স্বাদও আলাদা। অন্যদিকে এক পুলিশ সদস্য কাঁঠাল ভেঙ্গে খাচ্ছিলেন। আমন্ত্রণ পেয়ে লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। গপগপ করে গিলে ফেললাম বেশ কিছু রোয়া। ওবাইদুল্লাহ আর মনোয়ার ভাই লোলুপ দৃষ্টি ফেললেন বটে, কিন্তু আঠা লাগার ভয়ে মৌসুমের প্রথম কাঁঠাল খাওয়ার স্বাদ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করলেন।

রোদের তেজ কমে এসেছে। সূর্যের মিটমিটে আলো কর্ণফুলি নদী, কাপ্তাই হ্রদ ও পাহাড়ের বুকে যেন এঁকে দিচ্ছে মায়ার এক খেলা। সে মায়ায় মোহাবিষ্ট হয়ে বিরতি চলছে আমাদের কাফেলার। সত্যিই মায়া সৃষ্টিকারী রঙরাং চূড়াকে ছেড়ে আসতে মনের কোণে কষ্টের রেখা বিন্দুগুলো যেন সক্রিয় হয়ে উঠল। পাহাড় চূড়া থেকে এমন সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়, এ রকম পাহাড় আর কোথায় আছে এই বঙ্গদেশে!

বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ যেলা রাঙ্গামাটির বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে কাপ্তাই হ্রদের বুকে আমরা ভাসছি সারাদিন, এর পেছনের ইতিহাস কিঞ্চিত বলা প্রয়োজন। ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলি নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে 'পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র' স্থাপনের কাজ হাতে নিলে যেলার আটটি উপযেলার উপত্যকাঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়। বহু আদিবাসীকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয় পাহাড়ের পাদদেশ ও দ্বীপাঞ্চলে। অনেকেই আবার প্রতিবেশী দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ফসলের জমি, গবাদি পশুর চারণক্ষেত্রসহ বহু স্থলভূমি তলিয়ে যায় কর্ণফুলি আর কাসালং নদীর পানিতে। ইতিহাস যাই হোক, দুইশ' বর্গকিলোমিটারেরও অধিক আয়তনের কাপ্তাইকে বলা হয়ে থাকে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ কৃত্রিম লেক। যেলার আটটি উপযেলার অধিবাসীকে যোগাযোগের জন্য পুরোপুরি কিংবা আংশিকভাবে পানি পথের ওপর নির্ভর করতে হয়।

দুই পাশে পাহাড়। মাঝখান দিয়ে বহতা কর্ণফুলির বুকে চির চলছে আমাদের নৌকা নিরলসভাবে। সূর্য কখন জানি ঢাকা পড়ে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। যোহরের ছালাত বাকি রয়েছে। আছরের ওয়াক্তও যায় যায়। নৌকার ছাদে জামা'আতের আয়োজন করা হলো। অসম্ভব সে মুহূর্ত আল্লাহ যেন আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। ভাসমান নৌকার ছাদে ছালাত আদায় করার পর মনে হল, বিশাল এ পৃথিবীর বুকে মহান আল্লাহকে সেজদা করার জায়গা সবখানেই বিদ্যমান!

কর্ণফুলির বুকে নেমে আসল গোধূলির আলো। সাঁঝের প্রতিফলিত আলোয় নদীর পানি হয়ে উঠল শান্ত ও কোমল। ক্লান্তিহীন কাফেলার অবিরাম পথ চলায় এখনো কারো আনন্দানুভূতির শেষ হবার নয়। প্রকৃতির কাছে এসে তৃপ্তির ঢেকুর উঠলেও কৌতূহলোদ্দীনা শেষ হবে কি সহজে! গোধূলির ম্রিয়মান আলোয় কাপ্তাই হ্রদ ক্রমেই হারাতে বসল নিজের সুন্দর

রূপ। তবে আমরা হারালাম না নিজেদের উদ্দীপনা। সমতা বাজারে নামলাম যখন, আঁধারের আয়োজন তখন জমে উঠল ঘাটে ঘাটে।

**ফুরামন অভিযান :**

ফুরামন অভিযান নিয়ে পড়লাম শঙ্কায়। গাইড হিসাবে যাদেরকে প্রত্যাশা করেছিলাম, তাদের কেউ রাজি হ'ল না ফুরামনে আমাদের সঙ্গী হতে। রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের অনার্সের ছাত্র জেনেস চাকমা আগের দিন সাক্ষাতে বেশ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কী এক কাজ থাকায় তিনি আর যেতে পারবেন না বলে ফোনে জানিয়ে দেন। আর তবলছড়ির চাকমা ছেলে ইশান দেওয়ানও হাতছাড়া হয়ে গেল। গত বছর বর্ষাকালে ফুরামন অভিযানে ইশান ছিলেন আমার গাইড। যাই হোক, অবশেষে দ্বারস্থ হতে হল মানিকছড়ির মুদির দোকানদার গয়েনা চাকমার।

রাত যাপন শেষে সকালটা হলো অনেক চমৎকার। ফুরামনে ওঠার জন্য সবাই যেন চনমনে হয়ে উঠলেন। তানিম তো অস্থির হয়ে উঠল ফুরামনের চিন্তায়। এমনিতেই কাফেলার সদস্যরা রাঙ্গামাটির রূপ-লাবন্যে মুগ্ধ দারুণভাবে। তার ওপর আগের দিন কাপ্তাইলেক থেকে ফুরামনের চেহারা দেখে তাদের অস্থিরতা বেড়ে গেছে আরও বহুগুণে।

অভিযান শুরুর আগেই সকালের নাস্তা সেরে সমতা ঘাটে উপস্থিত হলাম আমরা। বুধবার রাঙ্গামাটির প্রসিদ্ধ তিন বাজার তবলছড়ি, রিজার্ভ বাজার এবং সমতা বাজারে বসে সাপ্তাহিক হাট। পাহাড়ে উৎপাদিত জুমের পণ্য নিয়ে এ সব বাজারে হাযির হন আদিবাসী জুম্মারা। শাক-সবজি, ফলমূল থেকে শুরু করে কত বিচিত্র পণ্যই না পাওয়া যায় এ দিন! পাহাড়িদের এ সব বাজার ঘুরে দেখাও দারুণ আনন্দ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয়। বাজারে কাত্তুলি, তারা সহ নানা ধরনের সবজি এবং ভিন্ন স্বাদের ফল রসকো আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিল। আর বৈশাখের শুরুতে পাকা আমও কি কম আকর্ষণের! রসকো আর আম কিনে হোটেলে ফিরে আসলাম। কিন্তু কাঁঠাল কেনা হলো না দেখে মনোয়ার ভাই মন খারাপ করলেন। কাঁঠাল না খেয়ে ফুরামন অভিযানে বের হবেন না, মনোয়ার ভাই যেন এমনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন। তার এ কাজে আমারও সম্মতি ছিল যথেষ্ট। ওবাইদুল্ল-াহ আর মনোয়ার ভাই পুনরায় বাজারে গেলেন। হোটেল থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ সমতা বাজার। হোটেলের ফ্লোরে ফল খাওয়ার আয়োজন করা হলো। উদোর পূর্তি হলো পাকা আম আর কাঁঠালের রসালো রোয়া দিয়ে। ফলে বাদ পড়ে গেল দুপুরের খাওয়ার মেন্যু। বেলা ১২টায় বনরূপা থেকে শুরু হয়ে গেল আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত ফুরামন অভিযান।

রাঙ্গামাটি শহরের বনরূপা বাজার থেকে মানিকছড়ির দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। মানিকছড়ির সাপছড়ি দিয়ে উঠতে হবে ফুরামন পাহাড়ে। গয়েনা আমার পূর্ব পরিচিত। গাইড ঠিক করে দিবেন বলে ফোনে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন আগের দিন রাতে। গত বছর দু'বার ফুরামন চূড়ায় উঠার সুবাদে এ পাহাড়ের দু'টো ট্রেইল আমার চেনা। ওঠা-নামার পথ চিনতে কোনো সমস্যা নেই আমার। কিন্তু বিশালায়তনের এ পাহাড়ের আশ-পাশে মানব বসতি খুবই কম। এছাড়া নিরাপত্তার বিষয়টিও ভেবে দেখবার বিষয়।

গয়েনার ভগ্নিপতি আশাপূর্ণ চাকমা গাইড হিসাবে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন মানিকছড়িতে। অন্তত একজন পাহাড়ি গাইড পেয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলাম। এরপর সাপছড়ি থেকে শুরু হলো আমাদের মূল অভিযান। ইট গাঁথা একটা রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের বুক চিরে। হাঁটছি সে পথ ধরে কাট ফাটা গরমের মাঝে। জনমানবহীন এ পথের পাশের গাছপালা পলবিত হতে শুরু করেছে। সেগুন আর গামারি গাছগুলো এখানো ন্যাড়া রূপ ধারণ করে আছে। বর্ষাকালে এ পথ থাকে ছায়া-শীতল-সবুজ। আধা ঘণ্টার মতো পথ হাঁটার পর পাহাড় উঁচু হতে লাগল। পাহাড়ি পথ মানেই ওঠা-নামা। ওপরে উঠলে পাওয়া যায় বাতাস, আর নিচে গুমোট আবহাওয়া। সবার শরীর ঘেমে যাচ্ছে গরমে। আসলে ট্রেকিং এর জন্য শীতকাল হ'ল যথাযথ সময়। গ্রীষ্মের গরমে দুপুর বেলা আমাদের এমন দুঃসাহস নেওয়াটাও কম কথা নয়। উপরন্ত ট্রেকিং এর জগতে সবাই নতুন।

মানিকছড়ি থেকে বয়ে আনা পানির বোতলগুলো ইতিমধ্যে খালি হতে চলেছে। অর্ধেক পথ যাওয়ার পর পেলাম কয়েকটি চাকমা বাড়ি। কিছুক্ষণ জিরাতে হল এখানে। পাহাড়ি শিশুদের খুঁজলাম চকলেট দেবার জন্য। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। কোন্ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তারা কোন্ স্কুলে গিয়েছে কে জানে!

উপরে যতই উঠতে থাকলাম, কাপ্তাইলেক, রাঙ্গামাটি শহর, দূরের পাহাড়ের সারি চোখের সামনে উদ্ভাসিত হতে লাগল অন্য রূপ ধারণ করে! এ এলাকাতে জনবসতি নেই বললেই চলে। দু'একটি বাড়ি চোখে পড়ে পাহাড়ের নিচে ভ্যালি এলাকাতে। দূরে এক পাহাড়ের পাদদেশে কোনো এক জুম্মিয়াকে কাজ করতে দেখে অভিভূত হলাম। উঠার পথে দু'জন চাকমা ছেলেকে

বড় আকারের দা হাতে দেখে আমাদের যাত্রা বিরতি ঘটল কিছুক্ষণ।

ওঠার পথ যেন শেষই হচ্ছে না। গরম ও ক্লান্তিতে অনেকের অবস্থা কাহিল। বোতলের পানিও প্রায় শেষ। কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে না নিয়ে আসাটাও হয়েছে বোকামি। ইতিমধ্যে কাউকে কাউকে ক্ষুধায় ঈষৎ গ্রাস করে ফেলেছে। যাই হোক, দুই ঘণ্টারও অধিক সময় হাঁটার পর পেলাম ফুরামনের মূল অংশ। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তায়াম্মুম করে যোহরের ছালাত আদায় করলাম ভালো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে।

ফুরামন মূলতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধ্যান কেন্দ্র। পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে আছে ভিক্ষুদের জন্য ধ্যান ঘর। এক ধ্যান ঘর থেকে আরেক ঘরের দূরত্ব ঘণ্টা খানেকের পথ! সুবিশাল এ পাহাড় যেন মানব বসতির অনপযুক্ত। এখানে তাই মানুষের দেখা পাওয়াও দারুণ এক আনন্দের বিষয়!

একদিকে কিয়োং অর্থাৎ বনবিহার। অন্যদিকে ফুরামন চূড়ায় উঠতে হয় লম্বা একটা সিঁড়ি বেয়ে। মনোয়ার ও তানভীর ভাই এবং তানিম তিনজনেই ভীষণ ক্লান্ত। সিঁড়ি বেয়ে তারা উঠতে চাইলেন না আর। কিন্তু ওবাইদুল্লাহ ও আমার চলার পালা থামল না। সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়লাম একেবারে চূড়ায়। কিছুক্ষণ পর দেখলাম তারা তিনজেই খুঁড়াতে খুঁড়াতে চূড়ায় উঠে আসলেন। গাইড আশাপূর্ণ ওপরে উঠবেন না আগেই জানিয়েছিলেন।

কাপ্তাইলেক, দিগন্তজোড়া পাহাড় আর ভাসন্ত মেঘের ভেলা ফুরামন বাদে রাঙ্গামাটির আর কোন্ পাহাড় থেকে এত সুন্দর করে দেখা যায়, আমার জানা নেই। ফুরামন পাহাড়ের মূল অংশ উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। পূর্ব দিকে পাহাড় ও কাপ্তাইলেকের সুবিশাল এলাকা জুড়ে রাঙ্গামাটি শহরের অবস্থান। এখান থেকে মনে হয় শহরের একাংশ পানির মধ্যে ডুবে আছে। নানিয়ারচর, জুরাছড়ি আর বরকলের দূর পাহাড় চোখে এনে দেয় আনন্দের ঢেউ। কাপ্তাইয়ের কাছে কর্ণফুলির বাঁকও চোখে পড়ে অবিশ্বাস্যভাবে। পশ্চিমে বহু দূরের চট্টগ্রাম শহরও নাকি চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে আকাশ পরিষ্কার থাকা সাপেক্ষে।

নিমেষে কষ্ট উবে গেল পাহাড় চূড়ায় ওঠার আনন্দে। দুই হাযার ফুটেরও অধিক উচ্চতার এ পাহাড়ে উঠে অভিভূত না হয়ে তো পারা যায় না। চাকমা ভাষায় ফুরামন বলতে বোঝায় 'সর্বোচ্চ পাহাড়'। কার্যতঃ বিলাইছড়ি উপযেলায় অবস্থিত দুমলং, হাফং বাদ দিলে রাঙ্গামাটি যেলার এটিই সর্বোচ্চ পাহাড়।

**প্রত্যাবর্তনের বিষাদ :**

ফেরার পালা শুরু হ'ল পায়ে হাঁটার ট্রেইল ধরে। আমাদের গাইড এ পথ চেনেন না। তবে আমি সবাইকে অভয় দিলাম। কেননা এ পথ দিয়েই আমার প্রথম ফুরামন অভিযান শুরু হয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে। তাই পথ চিনতে কোনো সমস্যা হবে না, এ আমার বিশ্বাস। কিয়োং ছেড়ে এসে বড় এক পানির ট্যাঙ্কি পেলাম। এত উঁচুতে ২০০০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাঙ্কি থাকার কারণ অবশ্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। কঠিন চীবর দানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আগত মানুষ-জনের জন্য পানির এ ব্যবস্থা। সবাই ওযূর কাজ সেরে নিলাম ট্যাঙ্কির ঠাণ্ডা পানিতে।

নামার পথটা অনেক খাড়া। তাই সবাইকে হাতে নিতে হ'ল একটা করে লাঠি। পাহাড়ে ওঠা-নামায় লাঠি বেশ সহায়ক। গাড়ি ওঠার পথ দিয়ে এ পাহাড়ে ওঠার সময় সাধারণত লাঠি লাগে না। খাড়া পথে নামার কাজটা কন্টকাকীর্ণ মনে হতে লাগল অনেকের কাছে। তানিমকে নিয়ে আমরা বেশি শঙ্কায় ছিলাম। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে অনেকটা পথ নেমে আসতে সক্ষম হলাম কোনো রকম বিপদ ছাড়াই। কিছু পথ বেশ বিপদজনক। নামার সময় সাবধানতা অবলম্বন না করলে সে পথে ঘটতে পারে বিপদ।

তেজহীন সূর্য কখন যেন পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল, টের পেলাম না। দক্ষিণের ফুরফুরে বাতাস ক্লান্ত শরীরে এনে দিল তেজ। উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল ক্ষুধার্ত দেহ। আছরের ওয়াক্ত ঢিলা হয়ে যাচ্ছে দেখে একটা জায়গা নির্ধারণ করলাম ছালাতের জন্য। পাহাড়ের পাদদেশে এমন নৈসর্গিক আবহাওয়ায় জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারব কখনো কী ভেবেছিলাম!

একেবারে পাহাড়ের নীচে নারাইছড়ি পাড়ার অবস্থান। উপত্যকা এলাকার এ পাড়ার বাড়ি-ঘরগুলো আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কাঠের তৈরি একটা টং ঘরের দোকান দেখে বিরতি নিলাম কিছু সময়। দোকানের ভিতরে বসে ওয়ার্ড মেম্বার কিরণ চাকমা ও পাড়ার কার্বারির সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ জমে উঠল আমাদের। সঙ্গে চা-কলা-বিস্কুট দিয়ে পেটের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টাও কম চলল না। ক্রমেই গোধূলির আলো ঘিরে ধরল উপত্যকাঞ্চলের এ লোকালয়কে। পেছনে ফুরামন চূড়া আর আদিবাসীদের সঙ্গে ক্ষণিকের সখ্যতার মায়া ছিঁড়ে আমাদের চলার গতিতে বাড়ল বেগ।

**বিদায় রাঙ্গামাটি :**

ফুরামন অভিযান শেষে বনরূপা বাজারে ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাগরিব ও এশার ছালাত এক সঙ্গে আদায় করে যেতে হ'ল ভুঁড়িভোজের জন্য উপবন হোটেলে। রাত আটটার গাড়িতে চেপে শুরু হবে ঢাকায় ফেরার পালা। সময় স্বল্পতার কারণে সব কাজেই করতে হ'ল তাড়াহুড়া। ফেরার কথা শুনে তানিমের মনটা খারাপ। আরো কয়েকটা দিন থাকতে পারলে হয়তো ভরতো তার মন কানায় কানায়। আসলে লেক-পাহাড়ের রাঙ্গামাটি ঘুরে মনকে তৃপ্ত করা সহজ কথা নয়! নেশার ক্ষুধাটা মনের কোণে সুড়সুড়ি দেবে বারবার। *[সমাপ্ত]*

*[লেখক : মুহাম্মাদ বদরুযযামান*
*প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি;*
*প্রতিষ্ঠাতা, ডেল্টা ট্যুরিজম বাংলাদেশ*

# নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকার

**ভূমিকা :**

ধর্মবোধের প্রকৃত ভিত্তিই হ'ল নৈতিকতা। এ জন্য ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব ও প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। নৈতিকতা কোন ব্যক্তির মধ্যে এমন আচরণ, যা অপরের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনা, উদারতা ও দানশীলতা, ধৈর্য, বিনয় ও নম্রতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হওয়াকে বুঝায়। এক কথায় পূণ্যাবলী সঠিক বিকাশ ও উৎকর্ষতা সাধনই নৈতিকতা। আর এটিই সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। যে সমাজের মানুষের মাঝে নৈতিকতাবোধ যতটা বেশী হবে সে সমাজের মানুষ ততটাই শান্তি ও নিরাপত্তা উপভোগ করবে। সমাজ জীবনে বসবাসরত প্রত্যেক মানুষের মাঝে দেখা দেয় প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি আর স্নেহমমতা। এ সবের উন্মেষ ঘটে তখনই যখন মানুষের মাঝে নৈতিকতাবোধ থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আজ আমাদের মাঝে নৈতিকতা লোপ পেয়েছে। বিলুপ্ত হয়েছে ন্যায়পরয়ণতার সিংহদ্বার। আর নৈতিকতা বর্জিত সমাজে দেখা দেয় ব্যক্তিগত, দলগত বা জাতীয় জীবনে সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, হানা-হানি, গীবত ও পরশ্রীকাতরতা। সৃষ্টি হয় একে অপরকে পর্যুদস্ত করার বাসনা। ফলে সৃষ্টি হয় নৈতিকতার অবক্ষয়। নিম্নে নৈতিক অবক্ষয়ের কতিপয় মৌলিক কারণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোকপাত কবর ইনশাআল্লাহ।

## নৈতিক অবক্ষয়ের মৌলিক কারণ

**◈ শিক্ষার অভাব :** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন প্রাণী যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। যে জাতি যতবেশী শিক্ষিত সে জাতি ততবেশী উন্নত। এই জন্য মহান আল্লাহ বিশ্ব মানবতার জন্য প্রথম যে নির্দেশনা দিয়েছেন তাহ'ল 'শিক্ষা'। তিনি বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড়! তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১)*। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮, সনদ ছহীহ)*। অতএব শিক্ষাই শক্তি, যার মাধ্যমে মানুষ সবকিছু জানতে পারে, বুঝতে পারে। প্রকৃতার্থে জ্ঞান অর্জনের দ্বারাই মানুষ সত্য-মিথ্যার, ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। পক্ষান্তরে যারা লিখতে, পড়তে জানে না তারা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় এবং সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে না। ফলে অপরাধ জগতের সাথে মিশে যায় এবং তাদের মাধ্যমে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

**◈ ইসলামী শিক্ষার অভাব :** ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সকল কালের সকল মানবের জন্য যুগোপযোগী একটি জীবন বিধান। কর্মহীন শিক্ষা যেমন অবাস্তব, ধর্মহীন শিক্ষাও তেমনই ফলদায়ক নয়। কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যেই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথনির্দেশনা রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষাকে সংকোচন করে কখনো নৈতিক শিক্ষা আশা করা যায় না। সঠিক সময়ে সমাজের সকলকে ধর্মীয় শিক্ষা না দেয়া গেলে তাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি এবং নৈতিকতা ও নীতিবোধ জাগ্রত হ'তে পারে না। তাই ধর্মীয় শিক্ষার অভাবকে নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ বলা হয়।

**◈ শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস :** শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের উৎস একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে সন্ত্রাস গড়ে উঠেছে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের কিছু বড় রাজনৈতিক দল তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষাঙ্গণগুলো কিছু ছাত্র ও অছাত্র দিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা রয়েছে শূন্যের কোঠায়। শিক্ষাঙ্গণে বিভিন্ন আবাসিক হলে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলছে। অথচ উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈতিকতা হবে প্রকৃত শিক্ষার পাদপীঠ। কিন্তু সেগুলো এখন অনৈতিক শিক্ষার কারখানায় পরিণত হয়েছে। এটিও নৈতিক অবক্ষয়ের মৌলিক কারণসমূহের অন্যতম।

**◈ বেকারত্বের প্রভাব :** বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের একটি উন্নয়শীল দরিদ্র দেশ। বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এ দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ৩৭০ মার্কিন ডলার। বেকারত্বের কারণে এদেশের দারিদ্রের অভিশাপ দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার মত নৈতিক চাহিদাগুলো এখনো অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে। বেকারত্বের কারণে গ্রাম ও শহরে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ যখন স্বাভাবিক ভাবে উপার্জন করতে পারে না তখন অপরাধের পথ বেছে নেয়। ফলে দেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা ইত্যাদির মত অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের জীবনসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হল যৌবনকাল (১৬-৪০)। আর বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুবক। সত্তর দশক থেকে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের যুবকদের জ্যামিতিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালে ২৩.৯১%, ১৯৭৪ সালে ২০.০০%, ১৯৮১ সালে ২৪.৫০% এবং ১৯৯১ সালে ৩০.২০% যুবক ছিল, যাদের বয়স (১৬-৪০) বছরের মধ্যে। ২০০৯ সালের তথ্য অনুযায়ী সে সময় যুবকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬ মিলিয়ন এবং বেকার শিক্ষিত যুবক ছিল ২২ মিলিয়ন। তাহ'লে ৫ বছর পর নিঃসন্দেহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে *(মাসিক আত-তাহরীক, ১৩ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৯, পৃঃ ৩৫)*।

**◈ মাদকের ছড়াছড়ি :** বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর মধ্যে মাদক অন্যতম। সংবাদপত্রের জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, নেশাগ্রস্ত ও অবৈধ চোরাচালান ব্যবসার সাথে জড়িত শতকরা নব্বই জন তরুণ-তরুণী, রাস্তাবাসী ও কর্মসংস্থানহীন। শহরের বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যুবক ৬০% এবং যুবতী ৫০%-এর বেশি নেশাগ্রস্ত। শুধু তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ জ্ঞান কেন্দ্রের ছাত্রীরাও জড়িয়ে পড়েছে নেশার জগতে। উক্ত নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে গণিকাবৃত্তিকে। যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য এরচেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে? ধনী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা অভিভাবকের কাছ থেকে পড়াশুনার খরচ বাবদ টাকা নিয়ে তা ব্যয় করছে নেশার দ্রব্য কিনতে। টাকা না পাওয়ার কারণে সুশিক্ষিত কন্যার হাতে বাবা-মায়ের হত্যার ঘটনাও ঘটেছে রাজধানীতে। ব্যাংক কর্মকর্তার হাতে প্রাণ হারিছে স্ত্রী ও পুত্রসন্তান, স্ত্রী তার বন্ধুদের নিয়ে হত্যা করেছে ব্যবসায়ী স্বামীকে, চট্টগ্রামের রাউজানে স্ত্রী তার স্বামীকে খুন করে ঘরের মধ্যে লাশ পুঁতে রেখে নির্দয়তার প্রমাণ রেখেছে এবং নেশাগ্রস্ত কন্যা ঐশী ধারালো ব্লেডের আঘাতে হত্যা করেছে নিজের পিতা-মাতাকে। মাদকতার এ রকম ভয়াবহ পরিণতি নৈতিকতাকে সত্যিই আজ হুমকির সম্মুখীন করেছে।

**◈ পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির অনুকরণ :** দেশের আপামর জনসাধারণ অপসংস্কৃতির অক্টোপাশে জড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব

হারিয়ে এখন সত্যের অমোঘ বাণী হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হ'ল ভ্যালেন্টাইন ডে বা ভালবাসা দিবস। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, যা উদ্দম নৃত্য, সীমাহীন আনন্দ-উল্লাস, তরুণ-তরুণীদের উষ্ণ আলীঙ্গন আর জমকালো নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতি উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়। বস্ত্রহীন দেহ, অসুস্থ মানসিকতা আর যৌন উত্তেজনার চূড়ান্ত পর্যায়ের দৃশ্যবলী বহিঃপ্রকাশ পরের দিন দেশের দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রথম পৃষ্ঠায় ঘটা করে প্রকাশ করা হয়। যেন বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটাই দেশীয় সংস্কৃতি। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন দিবসীয় সংস্কৃতি। মনে হয় যেন দিবসীয় সংস্কৃতির ভারে ছোট্ট-দ্বীপটি ভারাক্রান্ত। আছে ফ্যাশন ও বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি, যা দেখে যুবচরিত্র ধ্বংস হচ্ছে, জড়িয়ে পড়ছে নানা অশ্লীলতায়। ফলে নৈতিকতার অবক্ষয় আরো প্রকট আকার ধারণ করছে।

◈ **পর্ণোছবি বা ব্লু ফিল্মের নগ্ন ছবি :** বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় টিভি চ্যানেল, স্যাটেলাইট, টেলিফোন, মোবাইল প্রভৃতি সহ ইন্টারনেটের যেমন ভাল দিক রয়েছে তেমনি রয়েছে খারাপ দিকও। মোবাইল ফোনে গভীর রাতে প্রেমের আলাপচারিতা ও নগ্ন ছবি দর্শনে জীবন পাত করছে। যার ফলে অপরিণত বসসী তরুণ-তরুণীরা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। বেসরকারী সংস্থার জরিপের সারসংক্ষেপ : রাজশাহী মহানগরীতে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ৫ শতাধিক ছাত্রী, যাদের বয়স ১৩ থেকে ২৬ এর মধ্যে, তারা নিয়মিত দেহ ব্যবসায় লিপ্ত। মহানগরীর ৮টি হোটেলে খোলা-মেলা ভাবেই এবং নামী-দামী হোটেলগুলোতে চলে গোপনে। এছাড়া ১৫-২০টি আবাসিক হোটেল, বিউটি পার্লার, মেসেজ পার্লার ও রেষ্ট হাউজে চলছে রমরমা দেহ ব্যবসা। ছোট-বড় অন্তত ১০টি হোটেলে নির্মিত হচ্ছে পর্ণো ছবি। 'শিক্ষানগরী' বলে খ্যাত রাজশাহীর মত একটি শান্ত ও সুন্দর নগরীর ভিতরকার এই কলংকিত চিত্র বেরিয়ে আসার পর 'শিল্প নগরী' ও 'বন্দর নগরী' বলে খ্যাত চট্টোগ্রাম ও খুলনা মহানগরী এবং বিশ্বের এক নম্বর 'দূষিত নগরী' বলে খ্যাত রাজধানী ঢাকা মহানগরীর অবস্থা কেমন তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। সেই সাথে রয়েছে ইভটিজিং, লিভ টুগেদার ও সমকামিতার মত পশুস্বভাবের বিস্তার। যা অধিকাংশ পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির ভয়াল আগ্রাসন মাত্র *(সম্পাদকীয় মাসিক আত-তাহরীক ১৮ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা নভেম্বর ২০১৪)*। অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়েদের অত্যাধিক আদর করে। ফলে ১০-১২ বছরের ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দিচ্ছে মোবাইল ফোন, যাতে এ্যাকশনী ফিল্মের ছবি দর্শন করে বন্ধু-ভাই-বোন অথবা এলাকাবাসীর সাথে সে রকম আচরণ করছে। এভাবে নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে।

◈ **দুর্নীতি ও অনৈতিকতার অনুপ্রবেশ :** দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে দেশ আজ অন্ধকারের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছে। যার দু'একটি উপস্থাপনা করছি :

◈ **শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি :** কিছু কিছু শিক্ষকের নৈতিক চরিত্র স্খলনের কারণে শিক্ষা আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষনের মত অনৈতিক ও ঘৃণ্য কাজ যে সমাজে সংগঠিত হয় সে সমাজকে কী সভ্য ও শিক্ষিত সমাজ বলা যায়? অন্যদিকে শিক্ষক ক্লাসে না পড়িয়ে প্রাইভেট, টিউশনি ও বাণিজ্যিক কোচিং সেন্টারে পাঠদান, নিয়মিত রুটিং মাফিক ক্লাসে উপস্থিত না থাকা বা ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ অবৈধভাবে তসরুপ ও রাজনৈতিক দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য লোকদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দান, শিক্ষকের যথাযথ মূল্যায়ন না করা। শিক্ষায় নকল প্রবনতা, প্রক্সি দেওয়াসহ অসংখ্য দুর্নীতি ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে দেশের শিক্ষার গুণগত মানের চরম অবনতি ঘটেছে। ফলে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে উঠছে না *(ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৫১বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টোবর-ডিমেম্বর ২০১১, পৃঃ ১১৪)*।

◈ **চিকিৎসাক্ষেত্রে দুর্নীতি :** শিক্ষা ক্ষেত্রের মত চিকিৎসা ক্ষেত্রেও দুর্নীতির হিংস্র থাবা প্রবেশ করেছে। মেডিকেলের ছাত্ররা যখন পড়াশুনা করতে যায় তখন তাদের শ্লোগান হিসাবে বলা হয়, 'এসো শিক্ষার জন্য, যাও সেবার জন্য'। অথচ যখন একজন ছাত্র পড়াশুনা শেষ করে তখন এই নীতিবাক্যকে ভুলে যায় এবং সে অর্থের মোহে অনৈতিক/দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। সরকারি হাসাপাতালের ডাক্তাররা সময়মত উপস্থিত থাকে না। নিজেরা কাজ না করে নার্স বা বয়দের দ্বারা করায়। বেসরকারি অথবা নিজেদের পৃথক ক্লিনিক খুলে নির্ধারিত ফিস নিয়ে রুগী দেখে। এমনকি হাসপাতালেও নিজেদের ক্লিনিকের কার্ড দিয়ে প্ররোচিত করার মত ঘটনা ঘটে। এভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব প্রত্যেক ক্ষেত্রের দুর্নীতির কালো থাবা আমাদেরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

◈ **প্রতিকার :** ১. ধর্মীয় শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান। ২. অভিভাবকদের দায়িত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধিসহ ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা। ৩. নারী-পুরুষের সহশিক্ষা বন্ধ করা। প্রয়োজনে শিফটিং পদ্ধতি চালু করা। ৪. মসজিদ ও পঞ্চায়েতগুলোতে ধর্মীয় উপদেশ ও সামাজিক শাসন বৃদ্ধি করা। ৫. ধর্ম ও সমাজ বিরোধী মেলা ও অনুষ্ঠান বন্ধ করা। ৬. বিদেশী সংস্কৃতি বর্জন করা ও বিদেশী মন্দ চ্যানেলগুলো বন্ধ করা। ৭. ইন্টারনেট ও মোবাইলের মন্দ ব্যবহারের সুযোগগুলো বন্ধ করা। ৮. সেই সাথে এমন শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবে, যা এ মন্দ স্রোতকে বাধা দিবে এবং তার স্থলে সুস্থ স্রোত প্রবাহিত করবে।

যতদ্রুত মুরব্বী, যুবক, সোনামণি ও মহিলাদের মধ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার এবং মন্দ প্রতিরোধকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হবে, ততদ্রুত স্ব স্ব পরিবারে, সমাজে, ও রাষ্ট্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ *(সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক ১৮তম বর্ষ ২য় সংখ্যা নভেম্বর ২০১৪)*। তাই আসুন! আমরা এ সমাজ ও দেশকে ভালবাসি। সকলেই মিলে নিজেদের ও ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে একটি সুন্দর, সুখী, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী সমাজ ও দেশ গঠনে সম্মিলিত ভাবে আত্মনিয়োগ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!!

*মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম (উজ্জ্বল)*
*সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,*
*আখড়াখোলা এলাকা, সাতক্ষীরা।*

## শ্লীলতাহানি, ইভটিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদির জন্য দায়ী কি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, না-কি মেয়েদের উগ্র চালচলন !

সম্প্রতি পহেলা বৈশাখের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের TSC চত্বরে গুটি কয়েক ছেলেদের দ্বারা কিছু সংখ্যক মেয়েদের শ্লীলতাহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘুরে ফিরে সেই একই টপিক ফিরে এসেছে যে, 'শ্লীলতাহানি, ইভটিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদির জন্য দায়ী কী আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, না-কি মেয়েদের উগ্র চালচলন!'

এই ইস্যুতে সমাজের বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত। যারা বলছে, এই জন্য মেয়েদের উগ্র চলাফেরা এবং অশালীন পোশাক-আশাক দায়ী। আর তাঁদের মাঝেও আবার দু'টি শ্রেণী আছে! এক শ্রেণী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলে থাকে।

আরেক শ্রেণী সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলে থাকে। আবার যারা বলছেন, এজন্য পুরুষদের বা ছেলেদের উগ্র কামুক দৃষ্টিভঙ্গি-ই দায়ী, তাঁরাও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমদল ধর্মে বিশ্বাসী নন, নাস্তিক। অন্য দল ধর্মের কিছুটা মেনে চলেন, কিছুটা মানেন না।

যারা বলছেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার, তাঁরাও মূলতঃ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছেন না যে তাঁরা পরিবর্তন কীসের ভিত্তিতে চান! কোন্ জায়গা থেকে চান! না-কি তাঁরা এমন পরিবর্তন চান যে, ব্রাজিলের রাজপথে মেয়েরা পেন্টি আর ব্রা পরে! যেমন 'সাম্বা নৃত্য' চলে আর পুরুষেরাও জাঙ্গিয়া পড়ে সেটাতে অংশ নেয়! কেউ কাউকে হারাজমেন্ট করে না! যদি বলেন যে, না না! এমনটি চাই না। তাহ'লে কী চান! চাই যে সমাজের ছেলেরা মেয়েদেরকে নিজ বোনের মত মায়ের মত সম্মান দিবে। হ্যাঁ, যদি আপনার চাওয়া এটাই থাকে, তাহ'লে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে গোড়াতে, মানে শিশু কালে! কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার সময়কাল হচ্ছে ছোটকালে। এখন আপনি কীসের অনুকরণে ছোটকাল থেকে বাচ্চাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি যাতে পোষণ করে তার শিক্ষা দিবেন? এক্ষেত্রে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই যেহেতু মুসলিম, তাই এর সমাধানের জন্য ফিরে যেতে হবে কুরআন এবং হাদীছের দিকে, সেখান থেকে আমাদের সমাধান নিতে হবে। তাছাড়া এটা বিশ্ব মানবতার চূড়ান্ত সংবিধানও বটে।

এক্ষেত্রে আমি কুরআনের ৩টি আয়াত উল্লেখ করতে চাই। যথা- (১) পুরুষদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন' *(নূর ৩০)*। (২) মহিলাদের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে ...' *(নূর ৩১)*। (৩) মুসলিম সমাজের চিত্র কি হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ' *(নূর ২৭)*।

সুধী পাঠক! লক্ষ্য করুন, আল্লাহ প্রথমে সমাজের পুরুষদেরকে বলেছেন, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে নিচু রাখে। তারপর মেয়েদেরকে বলেছেন, তাঁরাও যেন পর্দা করে চলে, তাঁদের মাথার কাপড়টিকে তাঁদের বুক পর্যন্ত যেন ঝুলিয়ে নেয়। যাতে করে এর পূর্বে যে আল্লাহ্ পুরুষকে তাঁদের দৃষ্টিকে নীচে রাখতে বলেছেন তা পালন করতে তাদের সহজ হয়। আর পুরুষেরা যদি তা পালন করে তাহ'লে মেয়েদেরও তা পালন করতে সুবিধা হবে। পুরুষেরা যদি তাদের চোখকে সংযত করে চলে তাহ'লে নারীরা বেহায়ার মত সেজে-গুজে কার জন্য রূপ দেখাতে বের হবে! আর এতে করে কি হবে, নারীরা পাবে তাঁদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা। এক্ষেত্রে একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা সুধী পাঠকের সমীপে উল্লেখ করতে চাই। ঘটনাটি হ'ল-

একবার এক সঊদীর বাসায় গিয়েছিলাম কোন এক কাজে। নীচ তলায় ওর ছোট ভাইয়েরা ১০/১২ বছরের ছেলেকে নিয়ে দোতলায় যাই ওর বড় চাচাকে ডেকে দেওয়ার জন্য। ঐ বাচ্চা দরজা নক করলে ওর চাচাতো ভাই বের হয়ে আসে। সে কিছু কথা বলে তার সাথে। পরে তার চাচাতো ভাই ভিতরে চলে যায়। কিন্তু ঐ বাচ্চা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ ঘরের ভিতর ওর চাচী এবং চাচাতো বোনেরা ছিল, তাই ঐ ১০/১২ বছরের বাচ্চাটি প্রবেশ করেনি!

চিন্তা করুন, ঐ বাচ্চা ছেলেটি যখন বড় হবে তার দ্বারা কি কোন নারীকে ইভটিজিং, শ্লীলতাহানির মত ঘটনা ঘটতে পারে! না কখনোই না! কেননা তাঁকে ছোটকাল থেকেই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্ন হ'ল, সেই ছেলেটির সামনে যদি তার খালাত-মামাত-চাচাত ইত্যাদি বোনেরা প্রকাশ্যে চলে আসত, খোলামেলাভাবে পোশাক পরত আর এক সাথে বসে আড্ডা দিত তাহ'লে কি সেই ছেলের কাছ থেকে বড় হয়ে ঐসব বোন কিংবা সমাজের অন্য মেয়েরা তাঁদের সম্মানটুকু আশা করতে পারত! অবশ্যই না! মানুষকে সম্মান পেতে হ'লে অবশ্যই তাঁকে সেই স্থানে যেতে হবে, যেখানে নিজেকে নিয়ে গেলে সে সম্মানের অধিকারী হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, যখন কথা হচ্ছে মেয়েরা শুধু সম্মান চায়, কিন্তু সম্মানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চায় না। তাঁরা এক্ষেত্রে বলে থাকেন, আমরা যেমন খুশী তেমন ড্রেস পরব! পুরুষরা কেন আমাদের দিকে তাকাবে! ধর্ম কি তাঁদের এভাবে তাকাতে বলে! তাই তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিকে নীচে রাখুক! জী অবশ্যই পুরুষকে তাঁদের দৃষ্টি নীচে রাখবে, কেননা ধর্মে এটাই বলা আছে। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে ধর্মে কী বলা আছে এটা তো আপনি বললেন না! আপনাদেরকে তো পর্দা করার কথা বলা হয়েছে! সেই বিষয়টিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন! অথচ পুরুষদের ব্যাপারে কী বলা হয়েছে তা মুখস্থ করে নিয়েছেন!

আর যেসব পুরুষরা এই শ্লীলতাহানি, ইভটিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদির মত ন্যক্কারজনক কাজে লিপ্ত আছেন তাঁরা কিন্তু কেউই ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলেন না। তাই আপনাদের নিরাপত্তার কথা আপনাদের মাথায় রেখে আপনাদেরই আগে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান মেনে চলা উচিত নয় কি!

কেউ বলছেন, শ্লীলতাহানি, ইভটিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদি বন্ধের জন্য সহশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ছোটকাল থেকেই! যাতে করে ছোটকাল থেকে একে অপরকে কাছাকাছি থেকে দেখা-চেনা-জানার ফলে তাঁদের প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। আর এতে করে শ্লীলতাহানি, ইভটিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদির মত ঘটনা ঘটবে না। এসব কথা তারাই বলতে পারে যাদের, প্রকৃত কোন জ্ঞান নেই। মূর্খ লোকের কাছ থেকে সমস্যার সমাধান নিতে গেলে যা হয় আর কি! যেমন হয় কবিরাজের কাছ থেকে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিতে গলে!

সুধী পাঠক! এবার দৃষ্টি দিন অন্য জগতে। বিশ্বের সর্বাধিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে আমেরিকাতে। প্রতি বছর গড়ে ২ লাখ ৩৮ হাযার ৮৩৮ জন নারী ও শিশু ধর্ষিতা হন আমেরিকায়। কিন্তু সেখানে তো আপনাদের দেওয়া সমাধান সহশিক্ষার (co-education)-এর থেরাপি দেওয়া আছে। কিন্তু সেখানে এইসব ঘটে কেন! আর সঊদী আরব যেখানে বিশ্বের সবচাইতে কম ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সেখানে তো সহশিক্ষার থেরাপি দেওয়া হয় না! বরং সেখানে মেয়েদের স্কুলের ক্লিনারটাও পর্যন্ত মহিলা রাখা হয়! তো সেখানে কেন বিশ্বের সবচেয়ে ধর্ষণ কম হয়! কারণ একটাই সেখানে আসলে থেরাপি ঠিকই দেওয়া হয়, যেটা আল্লাহপাক কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

পরিশেষে বলব, আল্লাহপাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন আর তিনি ভালো করেই জানেন মানুষের সমস্যার সমাধান কোথায় কীভাবে কোন্ পদ্ধতিতে করতে হবে। তাই সকলকেই আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে আসতে হবে। তাতেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

*-তালহা খালেদ*
*দাম্মাম, সঊদী আরব।*

## শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদের দরসে

মসজিদে নববীতে যতগুলো দারস হয় তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং তালেবে ইলমদের ভীড়ে প্রাণবন্ত দারস হচ্ছে শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদের দারস। আমি তাঁর নাম মদীনা আসার অনেক আগেই শুনেছিলাম। তার বই পড়ার মাধ্যমে তার ছাত্র হওয়ার সুযোগ হয় গত বছর। দারুল উলূম দেওবন্দে আবুদাঊদ পড়ার সময় আমি তাঁর আবুদাঊদের শারাহ বা ব্যাখ্যগ্রন্থ থেকে সাহায্য নিতাম।

মদীনাতে আসার পর তার দরসে বসার মাধ্যমে তার সরাসরি ছাত্র হওয়ার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এখনো তার দরসে নিয়মিত হতে পারিনি। আমরা কুল্লিয়াতুল হাদীছের কোনও এক সেমিস্টারে অবশ্যই তাঁর ক্লাস পাব ইনশাআল্লাহ। তারপরেও মসজিদে নববীর দরসের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আমরা ক্লাসের দরসে পাব না।

শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ এখন অন্ধ। তাই দরস দেওয়ার সময় তাঁর সামনে কোনও কিতাব থাকে না। তিনি নিজের হিফয বা মুখস্থ শক্তির সাহায্যে দরস দেন।

এখন তিনি ছহীহ মুসলিমের 'কিতাবুল ইমারাতের' দরস দিচ্ছেন। তাঁর দরসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যিনি হাদীছের ইবারত পড়েন তিনিও আমাদের কুল্লিয়াতুল হাদীছের প্রথিতযশা ওস্তাদ শায়খ রুশায়দান। শায়খ রুশায়দান সর্ম্পকে বলা হয়, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদের যা ইলম আছে, তা সব তিনি নিয়ে ফেলেছেন। ফলত এই দরসে ছাত্ররা এক সাথে দুই মহান শায়খ থেকে উপকার হাছিল করার সুবর্ণ সুযোগ পায়।

শায়খ রুশায়দান প্রথমে হাদীছের ইবারত পড়েন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে থেমে থেমে। উল্লেখ্য যে, হাদীছের ইবারত পড়া সম্পর্কে আমার দুই ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। আব্বুর কাছে যখন মিশকাত বা বুলূগুল মারামের ইবারত পড়তাম, তখন ইবারত কারচুপি করার কোনও সুযোগ ছিল না। স্পষ্টভাবে সব হরফে যের-যবর-পেশ লাগিয়ে পড়তে হত। শেষের দিকে 'অলায য-লীনের' মত কোনও লম্বা টান দিয়ে ইবারত গোপন করার কোনও সুযোগ ছিল না। বরং 'অলায য-লীনা' বলার মাধ্যমে নূনের ইবারত স্পষ্ট করে পড়তে হত। এই জন্য তার দরসে ইবারত ভালভাবে ঠিক করে যেতে হত। আব্বুর এই দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রায় সকল ছাত্রের ভয়ের কারণ ছিল, ইবারত ভুল হলেই যে, মহাবিপদ....। আর সত্যি বলতে কি আজ যতটুকু যের-যবর-পেশ ছাড়া ইবারত পড়তে পারি, তা সেই সময়েরই চেষ্টার ফসল। সেই সময় আমাদের মধ্যে ইবারত পড়ার জন্য প্রতিযোগিতা চলত। উস্তাদ ক্লাসে আসতেই একসাথে চার-পাঁচ জন পড়া শুরু করত .. এক দেড় মিনিট চলার পর যার হিম্মত একটু বেশী থাকত সেই বেচারাই টিকে যেত। তারপর আস্তে আস্তে সে ছাড়লে আরেক জন ধরত...এই রকম।

দারুল উলূম দেওবন্দে আসার পর এর সম্পূর্ণ উল্টা ধরণ। ছাত্ররা সুর করে হাদীছের ইবারত পড়ত। ইবারত পাঠকদের নামের লিস্ট হত। যার যেই দিন নাম আসত সে সেই দিন পড়ত। দারুল উলূম দেওবন্দে সুর করেই হাদীছের ইবারত পড়েছি। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন বুখারীর ওস্তাদ মুফতী সাঈদ আহমাদ পালানপুরী। তিনি নিজেই হাদীছের ইবারত পড়তেন। তার দৃষ্টিতে এটাই আগের যুগের মুহাদ্দিছগণের রীতি, তারা হাদীছের ইবারত পড়ে ছাত্রদের শুনাতেন।

আর শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদের দরসে শুধু একজনই ইবারত পড়েন এবং সুর ছাড়াই থেমে থেমে।

যাইহোক শায়খ রুশায়দানের ইবারত পড়া হ'লে শায়খ আব্বাদ হাদীছের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা শেষ হ'লে শায়খ রুশায়দান আবার হাদীছ থেকে শুধু সনদ পড়েন এবং প্রত্যেক অপরিচিত রাবীর নামের সামনে থেমে যান, তখন শায়খ আব্বাদ তার স্মৃতি শক্তি থেকেই বলে দেন এই রাবীটা কে? তার পিতার নাম কী? তিনি কোথাকার অধিবাসী ছিলেন? এরপর আবার নতুন হাদীছ শুরু হয়।

তার মুখস্থ শক্তি থেকে দরস দেয়া দেখে আমি যারপর নাই আশ্চর্য হয়েছি। মহান আল্লাহ এই মহান মুহাদ্দিছের হায়াতে আরো বরকত দিন এবং আমার মত অধমকে তার থেকে পরিপূর্ণ উপকার হাছিলের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

***লেখক : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক***
***শিক্ষার্থী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।***

## আল্লাহ প্রদত্ত রুযীই আমার নির্ধারিত প্রয়োজন

আমি যে পরিবারের সন্তান, সেটা আর্থিকভাবে নিম্ন মধ্যবিত্ত বলা যায় না। দুঃস্থই বলা চলে। দিন আনা দিন খাওয়ার সংসার আমার আব্বার। সেখান থেকেই আল্লাহ আমাকে আমার আব্বার হাত দিয়ে আজকের এই পজিসনে নিয়ে এসেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। অনেক আর্থিক পিছুটান তাই আজও আমার রয়ে গেছে। বর্তমানে আমি একটি সরকারী ফ্ল্যাটে আছি। সরকারী ভবন মানে বুঝতেই পারছেন তার মেইন্টেনেন্স কি পর্যায়ের! আমার গ্রামের বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রের দূরত্ব যা, তাতে ডেইলি জার্নি সম্ভব নয়। অগত্যা মন্দের ভালো ফ্ল্যাটই সম্বল। মোটকথা আমার একটা ঘর দরকার। আর দশটা লোকের মত আমারো শখ আছে একটি ভালো ঘরের, একটি গাড়ির। গাড়ি প্রসঙ্গে বলা ভালো। শহুরে জীবনে গাড়ি খুবই যরূরী, বিশেষ করে আপনার যদি একটি কন্যা সন্তান থাকে। রাস্তাঘাট বা পাবলিক ভেইকলগুলোতে কেবল তারাই ভ্রমণ করতে পারবে যাদের নিতান্ত মজবুরি, নতুবা বেলজ্বাটে। আর্থিক সুস্থতা সম্পন্ন ভদ্র লোকের ক্ষেত্রে শহুরে বা মফস্বলীয় রাস্তাঘাটে গাড়ি বিহীন চলাফেরা সত্যি কষ্টকর। যাইহোক, আমার ইচ্ছাও আছে প্রয়োজনও আছে। কিন্তু উপায়? হ্যাঁ, তাও আছে, সেটি হচ্ছে দু'টি। প্রথমটি খুবই সহজ। আমি যা বেতন পাই এবং সরকারী কর্মী হবার সুবাদে খুব সহজেই কার লোন বা হোম লোন পেয়ে যাবো। সত্যি বলতে ইন্সটলমেন্ট পে করতে আমার খুব একটা কষ্টও হবে না। কিন্তু এ পদ্ধতিতে এগোনো

আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ এই প্রচলিত পথে রয়েছে সূদের মত বিষাক্ত কাঁটা। একজন মুসলিম হিসাবে আমি আমার আর্থিক জীবনও ইসলামের দায়রার মধ্যে কাটাতে চাই। তাই আর যাইহোক অন্তত সূদের সাথে সম্পৃক্ততা রাখতে চাই না। আমার চাওয়া না চাওয়াতে কিছু যায় আসে না। কারণ নিষেধাজ্ঞাটি আল্লাহ্র, যেখানে আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের কোন এখতিয়ার নেই। তাই এ পদ্ধতিটি আমি খুব সহজেই ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছি।

অনুতাপ, আফসোস তো নেইই, বরং রয়েছে দীর্ঘশ্বাসের সাথে একটি স্বস্তিময় কৃতজ্ঞতা আদায়কারী শব্দ 'আল হামদুলিল্লাহ'। আমি পেরেছি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে। পেরেছি প্রতিটি দিরহামের বদলে ৩৬ বার যিনার গুনাহ হ'তে নিজেকে পরিত্রাণ করতে। পেরেছি নিজের মায়ের সাথে যিনার মত ঘৃণ্য পাপ হ'তে নিজেকে যোজন দূরত্বে নিয়ে যেতে। আমি আর্থিকভাবে তাই সুস্থ। যদি টাকা বাড়ানোর প্রয়োজন পড়ে, চিটফান্ডের দ্বারস্থ হবার আমার প্রয়োজন পড়বে না। ছাদাক্বা করব, আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়াব। দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোটেনা যাদের, তাদের অন্ন বাসস্থানের সুযোগ করে দেব। অসহায় রুগীদের চিকিৎসা বা দরিদ্র সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করব। তাতেই বাড়বে আমার সম্পদ- দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। আহ! কতইনা ভাগ্যবান আমি।

আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ বর্ধনের এই কৌশল প্রাপ্তিতে আমি ধন্য। তবে প্রবৃত্তির দাস ও দুনিয়াপূজারী কিছু নামধারি মুসলিম আমাকে তিরস্কার করতেও ছাড়ে না। তারা বলে, তুমি কোনদিন বাড়ি গাড়ি করতে পারবে না। আমি বলি- বিনা সূদে যদি এগুলো করতে পারি, তাহ'লে ভাববো এগুলো আমার প্রয়োজন ছিল, তাই আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। যদি না পারি, ভাববো, এগুলোর কোন প্রয়োজন আমার ছিল না। তাই আল্লাহ আমাকে দিলেন না। আমার প্রয়োজন কী তা, আমার চাইতে আমার প্রতিপালক বেশি জানেন।

অতএব কোনই আক্ষেপ নেই, কোনই দুঃখ নেই। বরং পাওনা না পাওয়ার বিষয়ে এই যে আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়ার সম্পদ আমি সেই রহমানের নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছি, তারই বিনিময়ে আমি পাব জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত। ক্ষণিকের এই দুনিয়ার যাবতীয় সম্পত্তিও তাঁর সমকক্ষ নয়। তারা বলে, রিটায়ারের পরে কী করবি? আমি বলি, গাছ তলায় থাকাই যদি তাক্বদীর হয়, ইনশাআল্লাহ কোন অসুবিধা নেই। আমি জানি একটি ইট সোনা আর একটি ইট রূপা দিয়ে তৈরী জান্নাতী বাসভবন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। পোড়া ইটের তৈরী ঘর তাই আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। যার সামনে রয়েছে সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর শান্তির নীড় জান্নাতের হাতছানি, সে কিভাবে সূদের সাথে নিজেকে জড়ায়? তাই আমি মুসলিম হিসাবে দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলাম। আর তা হ'ল এই যে, আল্লাহ যেভাবে রূযী দিয়েছেন, যতটুকু দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট আমি। আল্লাহ প্রদত্ত এই রূযীতে হালাল উপায়ে যতটুকু আমি করতে পারব ভাববো সেটাই আমার আল্লাহ নির্ধারিত প্রয়োজন। হালাল রূযীর আয়ত্তের বাইরে যা কিছুই থাকবে সবই আমার জন্য অপ্রয়োজনীয়। এতেই আমি সুখ পাই। আপনিও চেখে দেখতে পারেন।

*-ছাবের আলী মোল্লা*
*এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার,*
*বিদ্যুৎ ভবন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*

## কিছু মূল্যবান বাণী

☞ শায়খ খারীবি (রহঃ) বলেন, '(সালাফে ছালেহীনগণ) পসন্দ করতেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি গোপনীয় সৎ আমল থাকবে যা তার স্ত্রী এবং অন্য কেউ জানবে না' *(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৩৪৯)*।

☞ আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! সত্যবাদী বান্দা মাত্রই পসন্দ করে যে, তার অবস্থান যেন কোনক্রমে উপলব্ধি না করা হয়'।

☞ সালমাহ ইবনু দিনার (রহঃ) বলেন, 'তুমি তোমার সৎ আমলগুলো গোপন কর আর এটা অধিক কঠিন' *(হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/২৪০)*।

☞ বিশরুল হাফী (রহঃ) বলেন, 'তুমি তোমার খ্যাতি নিষ্ক্রিয় কর এবং তুমি হালাল খাবার খাও। কোন ব্যক্তি পরকালের নিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না, যে পার্থিব জীবনে মানুষের প্রশংসাকে পসন্দ করে' *(মিনহাজুল ক্বাছিদীন, পৃঃ ২১০)*।

☞ মুহাম্মাদ বিন 'আলা (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে পসন্দ করে মানুষ তাকে যেন না চেনে' *(ইবনু কাছীর ৬/৩৪৩)*।

☞ ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, 'আমি ভালবাসি মানুষ আমার থেকে এই ইলম শিক্ষা অর্জন করবে এবং তা থেকে কিছুই আমাদের দিকে সম্বোধন করা হবে না' *(হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/১১৮)*।

## লেখা আহ্বান

এতদ্বারা সকল পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যে সকল লেখক-লেখিকা **'সোনামণি প্রতিভা'** পত্রিকায় প্রবন্ধ, মতামত ও প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, লেখা সোনামণিদের পাঠ উপযোগী হতে হবে।

**যোগাযোগের ঠিকানা**
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১
**তাওহীদের ডাক**

# আলোকপাত

*-তাওহীদের ডাক ডেস্ক*

***প্রশ্ন (০১/৬০) : দেওবন্দী তরীকার উৎপত্তি ও তাদের আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই?***

*-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, সিঙ্গাপুর।*

**উত্তর :** ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর যেলার অন্তর্গত একটি এলাকার নাম 'দেওবন্দ'। এখানে মাওলানা কাসিম নানোতুবী (মৃঃ ১৮৭৯ খৃঃ) ১৮৬৮ সালে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার আধ্যাত্মিক গুরু ভারতের ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (মৃঃ ১৮৯৯ খৃঃ)-এর নিকট মুরীদ হন *(ইরশাদুল মুলক, পৃঃ ৩২)*। অনুরূপ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হিঃ/মৃঃ ১৯৪৩ খৃঃ) এবং মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীও (মৃঃ ১৯০৮ খৃঃ) তার নিকটে বায়'আত করেন এবং মুরীদ হন। উক্ত মাদরাসা ও সেখানকার আলেমদের মাধ্যমে 'দেওবন্দী' মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উপমহাদেশের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উক্ত তরীক্বার অনুসারী। তারা কেবল দেওবন্দী ফাতাওয়াকেই অনুসরণ করে। বাংলাদেশে হাটহাযারী, পটিয়া, বগুড়ার জামীল মাদরাসা, নওগাঁর পোরশা মাদরাসা এবং পাকিস্তানে দারুল উলূম করাচি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এই তরীকার প্রচারক। পাকিস্তানের তাক্বী ওসমানী দেওবন্দী তরীকার সবচেয়ে পরিচিত ব্যক্তি। তবে সকলেই ছূফী তন্ত্রে বিশ্বাসী। দেওবন্দী আলেমদের নিকটে বায়েযীদ বুস্তামী, মানছূর হাল্লাজ খুবই প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

উল্লেখ্য যে, দেওবন্দী তরীকার দাওয়াতী শাখা হ'ল, তাবলীগ জামায়াত। আম জনতার মাঝে ছূফী ইমদাদুল্লাহর দর্শন প্রচারের ছদ্মবেশী তরীকা হ'ল এই তাবলীগ। এই জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী দর্শনের পৃষ্ঠপোষক মাওলানা ইলিয়াস (১৮৮৫-১৯৪৪ খৃঃ)। তিনি দেওবন্দী আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর প্রতি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তিনি বলতেন, 'হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থানভী দ্বীনের প্রভূত খেদমত করেছেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা হ'ল, দ্বীনের শিক্ষা হবে তাঁর এবং দাওয়াহ্‌র প্রায়োগিক প্রক্রিয়া হবে আমার, যাতে করে তাঁর শিক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে' *(মালফূযাতে ইলিয়াস, পৃঃ ৫৮)*।

**দেওবন্দীদের ভ্রান্ত আক্বীদা :**

**(এক) আকাবির আলেম মৃত্যু বরণ করেন না :**

দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা নানোতুবী মৃত্যু বরণের বহু দিন পর এক সমস্যা সমাধানের জন্য মাদরাসায় আগমন করেন। যেমন- এক সময় মাওলানা আহমাদ হাসান আমরুহী এবং ফখরুল হাসান গাঙ্গুহীর মাঝে মনোমালিন্য হয়। কিন্তু মাওলানা মাহমূদুল হাসান (১২৩৮-১৩৩৮ হিঃ) নিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এক পক্ষের দিকে ঝুঁকে যান। তখন মাওলানা রফীউদ্দীন মাওলানা মাহমূদুল হাসানকে ডেকে পাঠান। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই তিনি বলছেন, আগে তুমি আমার কাপড় দেখ। শীতকাল হওয়া সত্ত্বেও তার সমস্ত কাপড় ভিজে গেছে। রফীউদ্দীন বললেন, মাওলানা কাসেম নানোতুবী জাসাদে আনছারীতে এখনই আমার নিকট এসেছিলেন। তাই ঘামে আমার কাপড় ভিজে গেছে। তিনি আমাকে বলে গেলেন, তুমি মাহমূদুল হাসানকে বলে দাও, সে যেন ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। আমি শুধু এটা বলার জন্যই এসেছি *(আরোহায়ে ছালাছা, হেকায়েতে আওলিয়া, পৃঃ ২৬১)*।

দেওবন্দী মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (মৃঃ ১৯০৮ খৃঃ) তার 'আল-বারাহী আল-ক্বাতিয়া' গ্রন্থে বলেন, আমার মনে হয়, আল্লাহ্‌র নিকট দেওবন্দ মাদরাসা প্রশংসিত আসন পেয়েছে। কারণ অসংখ্য আলেম এখান থেকে পাশ করেছেন এবং জনসাধারণের অনেক কল্যাণ সাধন করেছেন। পরবর্তীকালে এক মহান ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দর্শন লাভ করে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি দেখেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) উর্দূ ভাষায় কথা বলছেন। তখন ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি একজন আরবী লোক, কিভাবে এই ভাষা জানলেন? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বলেন, 'যখন থেকে দেওবন্দের আলেমদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, তখন থেকেই আমি এই ভাষা জানি'। গাঙ্গুহী আরো বলেন, এ থেকে আমরা এই মাদরাসার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারি *(আল-বারাহী আল-ক্বাতিয়া, পৃঃ ৩০)*।

**(দুই) মানবদেহে আল্লাহ্‌র অনুপ্রবেশ আক্বীদায় বিশ্বাসী :**

দেওবন্দী মতবাদের আধ্যাত্মিক নেতা ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী বলেন, 'মা'রেফতের অধিকারী ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বশীল হয়। আল্লাহ তা'আলার যে কোন রশ্মিকে নিজের জন্য ধরে নিতে পারে। আল্লাহ্‌র যে কোন গুণে ইচ্ছা নিজেকে বিভূষিত করে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে। যেহেতু তার মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলী বিদ্যমান এবং আল্লাহ্‌র চরিত্রে বিলীন *(যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ২৭-২৮)*। অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন, 'কোনরূপ আড়াল ছাড়াই সে আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সে সুযোগ পাবে *(যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ৭ ও ২৫)*। তিনি আরেক জায়গায় বলেন, 'তাওহীদে জাতি হ'ল এই যে, বিশ্বজগতের সবকিছুকে আল্লাহ বলে ধারণা করা' *(যিয়াউল কুলূব (উর্দূ), পৃঃ ৩৫)*।

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী বলেন, 'মনোযোগ দিয়ে শোন! সত্য তা-ই যা রশীদ আহমাদের মুখ থেকে বের হয়। আমি শপথ করে বলছি, আমি কিছুই না, কিন্তু এ যুগে সৎপথ প্রাপ্তি এবং সফলতা নির্ভর করে আমার ইত্তেবার উপর' *(তাযকিরাত আর-রশীদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭)*।

সুধী পাঠক! এ ধরনের অসংখ্য শিরকী ও কুফুরী আক্বীদা তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার নামে তারা মুসলিম সমাজে এভাবেই শিরক, বিদ'আত ও কুফুরীর প্রসার ঘটাচ্ছে।

***প্রশ্ন (০২/৬১) : হাদীছ বিরোধীদের অভিযোগ সমূহ কয়টি ও কি কিঃ***

*-মফীযুল ইসলাম, কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়*

**উত্তর :** হাদীছ বিরোধী পণ্ডিতগণের অভিযোগ সমূহ প্রধানতঃ পাঁচটি। যা মূলতঃ মু'তাযিলা পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছিল। সেখান থেকে আধুনিক প্রাচ্যবিদগণ নিয়েছেন। অতঃপর সেখান থেকে আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ নামে খ্যাত কিছু মুসলিম পণ্ডিত নকল করেছেন। যেমন (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে হাদীছ সমূহ লিবিবদ্ধ হয়নি। (২) ছাহাবীগণ হাদীছ লেখার ব্যাপারে রাসূলের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝেছিলেন বলেই তাঁরা হাদীছ লিপিবদ্ধ করেননি। (৩) রাসূলের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে প্রথম হাদীছ সংকলিত হয়। পরে তা হারিয়ে যায়। অতঃপর তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে এসে লোকদের মুখ থেকে শুনে তা পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হয়। (৪) জাল হাদীছ সমূহ ছহীহ হাদীছ সমূহের সাথে মিশে যায়। যা পরে পৃথক করা সম্ভব হয়নি। (৫) মুহাদ্দিছ

বিদ্বানগণ হাদীছ বাছাইয়ের যে সব মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, তার সমস্তটাই সনদ ও রাবীদের সমালোচনায় কেন্দ্রীভূত। মতনের আসল-নকল যাচাইয়ের প্রতি তাঁরা যথাযথ নযর দেননি।

উথচ উক্ত অভিযোগগুলোর সবই মিথ্যা। বরং সূর্যের মুখে ধুলা ছিটানোর শামিল। হাদীছ শাস্ত্রের একজন সাধারণ পাঠকও এসব কথার জবাব দিতে পারেন *(হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ২৯-৩০)*।

***প্রশ্ন (০৩/৬২) : আক্বাবার ১ম বায়'আত কত সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং উক্ত বায়'আতে কতজন উপস্থিত ছিলেন?***

*-নযরুল ইসলাম, রাজনগর, সাতক্ষীরা*

**উত্তর :** ১১ নববী বর্ষে ৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই আক্বাবার ১ম বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত বায়'আতে ইয়াছরিবের খাযরাজ গোত্রের ৬ জন সৌভাগ্যবান যুবক উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে নেতা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ তরুণ আস'আদ বিন যুরারাহ। বাকী ৫ জন হলেন, 'আওফ ইবনুল হারিছ, রাফে' বিন মালেক, কুৎবা বিন 'আমের, উক্ববাহ বিন 'আমের ও জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুম)।

***প্রশ্ন (০৪/৬৩) : আহলেহাদীছের বাহ্যিক নিদর্শন জানতে চাই?***

*- সেলিম রেযা, ঢাকা।*

**উত্তর :** আহলেহাদীছের বাহ্যিক নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আব্দুর রহমান ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ) বলেন, (১) কম হউক বেশী হউক সকল প্রকারের মাদকদ্রব্য ব্যবহার হ'তে তারা বিরত থাকেন (২) ফরয ছালাত সমূহ আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের জন্য তারা সদা ব্যস্ত থাকেন (৩) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়াকে তারা ওয়াজিব মনে করেন (৪) ছালাতের মধ্যে রুকূ-সুজূদ, ক্বিয়াম-কু'উদ ইত্যাদি আরকানগুলোকে ধীরে-সুস্থে শান্তির সঙ্গে আদায় করাকে তারা অপরিহার্য বলেন এবং এতদ্ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না বলে তারা মনে করেন (৫) তারা সকল কাজে নবী (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের কঠোর অনুসারী হয়ে থাকেন (৬) বিদ'আতীদেরকে তারা ঘৃণা করেন। তারা বিদ'আতীদের সঙ্গে উঠাবসা করেন না বা তাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক ঝগড়া করেন না। তাদের থেকে সর্বদা কান বন্ধ রাখেন, যাতে তাদের বাতিল যুক্তি সমূহ অন্তরে ধোঁকা সৃষ্টি করতে না পারে *(আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৯৯-১০০)*।

আমরা বলি, আহলেহাদীছের সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন হ'ল এই যে, তারা হ'লেন আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন সুন্নাতপন্থী। তবে এখানে বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য যেমন আহলেহাদীছ বাপের সন্তান হওয়া শর্ত নয়। তেমনি রক্ত, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলেরও কোন ভেদাভেদ নেই। বরং যেকোন মুসলিম নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ও সেই অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেই কেবল তিনি 'আহলেহাদীছ' নামে অভিহিত হবেন। নিঃসন্দেহে আহলেহাদীছ-এর প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমলের মধ্যে নিহিত। তার পিতৃ পরিচয়, বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-সম্পদ বা সামাজিক পদ মর্যাদার মধ্যে নয় *(আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ১৮)*।

***প্রশ্ন (০৫/৬৪) : মুসলিমদের মধ্যে নানাবিধ বিভক্তির মূল কারণ কয়টি ও কি কি? দলীল সহ জানতে চাই।***

*-জাহিদুল ইসলাম, মুচড়া, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্তির মূল কারণ চারটি। যথা (১) ইহুদী-খ্রীষ্টানদের প্ররোচনা (২) রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব (৩) বিজাতীয় প্রথা ও দর্শন চিন্তার অনুপ্রবেশ এবং (৪) শরী'আতের ব্যাখ্যাগত মতভেদ *(আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ৩০-৩১)*।

***প্রশ্ন (০৬/৬৫) : ফিরক্বা নাজিয়াহ্‌র নিদর্শন কয়টি ও কি কি? দলীল সহ জানতে চাই।***

*-আবুল হোসেন, নাটোর।*

**উত্তর :** ফিরক্বা নাজিয়াহ্‌র নিদর্শন ৪টি। যথা : (১) তারা আক্বীদা, ইবাদত ও আচরণে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নীতির উপর দৃঢ় থাকেন এবং সর্বদা ছহীহ হাদীছের উপর আমল করেন। তারা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করেন এবং আপোষে মহব্বতের সম্পর্ক অটুট রাখেন (২) তারা সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যান এবং সালাফে ছালেহীন ও মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের মাসলাক অনুসরণে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দেন (৩) তারা ব্যাখ্যাগত মতভেদ-কে লঘু করে দেখেন এবং কখনোই তাকে দলীয় বিভক্তিতে পরিণত করেন না এবং (৪) তারা সর্বদা উত্তম মুমিন হওয়ার জন্য চেষ্টিত থাকেন এবং এজন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন *(ফিরক্বা নাজিয়াহ, পৃঃ ৫৪-৫৫)*।

***প্রশ্ন (০৭/৬৬) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর একজন 'প্রাথমিক সদস্য' ও 'কর্মী'র গুণাবলী জানতে চাই।***

*-শরীফুল ইসলাম, মাদনগর, নাটোর*

**উত্তর :** অনধিক ৩২ বছরের যে সকল তরুণ, যুবক ও ছাত্র নিম্নোক্ত গুণাবলী অনুসরণ করবেন তারা 'যুবসংঘ'-এর 'প্রাথমিক সদস্য' হিসাবে গণ্য হবেন। যেমন (ক) নিয়মিত ছালাত আদায় করেন (খ) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে বিনা শর্তে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেন (গ) নির্ধারিত 'সিলেবাস' অধ্যয়নে রাযী থাকেন (ঘ) 'প্রাথমিক সদস্য' ফরম পূরণ করেন ও সংগঠনের নির্দেশ পালনে প্রস্তুত থাকেন।

আর যে সকল 'প্রাথমিক সদস্য' নিম্নোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হবেন তারা 'যুবসংঘ'-এর 'কর্মী' হিসাবে গণ্য হবেন। যেমন (ক) সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সাথে সচেতনভাবে একমত হন (খ) যিনি সংগঠনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল, তাক্বওয়াশীল এবং হালাল রুযীর ব্যাপারে সচেতন থাকেন (গ) যিনি সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেন এবং অন্য কোন আদর্শিক সংগঠনের সাথে কোনরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক রাখেন না (ঘ) যিনি যাবতীয় হারাম ও কাবীরা গুনাহ হ'তে বিরত থাকেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। (ঙ) যিনি নিয়মিত এয়ানত দেন এবং ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখেন ও দেখান। (চ) যিনি নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উপরিউক্ত মর্মে নির্ধারিত ফরম পূরণ করেন ও কেন্দ্রের অনুমোদন লাভ করেন এবং কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট শপথ নেন *(বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর গঠনতন্ত্র, পৃঃ ৪-৫)*।

***প্রশ্ন (০৮/৬৭) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর এলাকা গঠনের নিয়ম-পদ্ধতি জানতে চাই।***

*আখতারুল আনাম, কুড়িগ্রাম*

**উত্তর :** (ক) যেলা কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা নিয়ে একটি 'সাংগঠনিক এলাকা' গঠিত হবে। (খ) যেলা সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট উপযেলা এবং শাখা সভাপতিদের সাথে পরামর্শক্রমে এলাকা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ন দিবেন। উক্ত তিনজন যেলা সভাপতি ও তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি ও পরামর্শক্রমে অনধিক ১০ (দশ) সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ 'এলাকা কর্মপরিষদ' গঠন

করবেন ও শপথ নিবেন। (গ) প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য যেলা সভাপতি একজনকে আহ্বায়ক, একজনকে যুগ্ম-আহ্বায়ক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি 'এলাকা আহ্বায়ক কমিটি' গঠন করতে পারবেন। যার মেয়াদ অনধিক ছয় মাস হবে। (ঘ) এলাকার অধীনস্ত উপযুক্ত কোন স্থানে যেলার অনুমোদন সাপেক্ষে 'এলাকা কার্যালয়' স্থাপিত হবে। (ঙ) উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'এলাকার'র মর্যাদা পাবে। (চ) ক্ষেত্র বিশেষে কোন একক এলাকা 'ওয়ার্ড' অথবা 'ইউনিয়ন' নামে অভিহিত হবে। (ছ) ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'এলাকা কর্মপরিষদ' নিম্নরূপ : সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও দফতর সম্পাদক।

***প্রশ্ন (০৯/৬৮) : 'কুরআনই রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র' হাদীছটি কোন্ গ্রন্থে বর্ণিত?***

*আব্দুল জাব্বার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

**উত্তর :** হাদীছটি মুসনাদে আহমাদে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে *(হা/২৪৬৪৫)*।

***প্রশ্ন (১০/৬৯) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর একজন কর্মী সৃষ্টির ধারাবাহিকতা তথা পদ্ধতি কি তা জানতে চাই।***

*-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, পাবনা*

**উত্তর :** (ক) টার্গেটকৃত কর্মীকে আন্দোলনের ভবিষ্যত হিসাবে গণ্য করে তাকে আন্দোলন বিষয়ক গভীর জ্ঞানদানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মাঝে মধ্যে আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা ও প্রকাশ করা যায় এমন বিষয়ে তার নিকট আন্তরিকভাবে পরামর্শ চাইতে হবে। (খ) তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে যৎসম্ভব সহায়তার হাত প্রসারিত করতে হবে। (গ) জান-মাল কুরবানী করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং প্রদর্শনেচ্ছায় নয় বরং আন্দোলনের স্বার্থে আপনার কর্ম চাঞ্চল্যতা তার সামনে এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে, যাতে সে আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রমে আত্মত্যাগী হয়ে ওঠে। (ঘ) মেজায বুঝে পরিকল্পনা মুতাবেক বই পড়াতে হবে এবং বইটি পড়ার পরে তার মতামত যাচাই করতে হবে। কোন প্রশ্ন থাকলে সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। (ঙ) জামা'আতে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং উহার ফযীলত বর্ণনা করতে হবে। (চ) তাবলীগী সফরে নেবার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে আন্দোলনের কাজে সময় কুরবানীর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। (ছ) মাঝে-মধ্যে ছোট-খাট সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়ে তাকে ক্রমে গড়ে তুলতে হবে।

এভাবে একজন প্রাথমিক সদস্যদের মধ্যে যখন গঠনতন্ত্রের ৭ নং ধারার ২ নং উপ-ধারায় বর্ণিত কর্মীর যাবতীয় গুণাবলী ফুটে উঠবে এবং এই মর্মে কেন্দ্রীয় সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে শপথ গ্রহণ করবেন, তিনি 'যুবসংঘ'-এর কর্মী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। কর্মীগণ আন্দোলনের বিশেষ শক্তি হিসাবে বিবেচিত হবেন। তাদেরকে দৈনন্দিন করণীয় ও কার্যাবলী যথাযথ পালনের সাথে সাথে উর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশ পালনে সক্রিয় প্রস্তুত থাকতে হবে।

***প্রশ্ন (১১/৭০) : 'তোমরা কদু (লাউ) অপরিহার্য করে নাও, কারণ তা অনুভূতি বৃদ্ধি করে। তোমরা ডালকে অপরিহর্য করে নাও, কারণ তার পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছে সত্তরজন নবীর ভাষায়' হাদীছটি কি ছহীহ?***

*ইনামুল হক্ব*
*রাষ্ট্র বিজ্ঞান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

**উত্তর :** না, বরং জাল হাদীছ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০; যঈফুল জামে' হা/৩৭৭২)*।

***প্রশ্ন (১২/৭১) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী 'তানযীম' বা সংগঠনের করণীয় কি বিস্তারিত জানতে চাই***

*-মেছবাহুল আলম জুয়েল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।*

**উত্তর :** দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী 'তানযীম' বা সংগঠনের ক্ষেত্রে করণীয় হ'ল : যে সকল যুবক নিজেদেরকে খাঁটি ইসলামী চরিত্রে গড়ে তুলতে এবং সমাজের বুকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধান কায়েমের আন্দোলনে অংশ নিতে প্রস্তুত, তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা। এ ক্ষেত্রে দু'টি স্তর রয়েছে। যথা : কর্মীদের স্তর ও সাংগঠনিক স্তর। কর্মীদের স্তর আবার তিনটি। যথা : প্রাথমিক সদস্য, কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য। সাংগঠনিক স্তর পাঁচটি। যথা : শাখা, এলাকা, উপযেলা, যেলা ও কেন্দ্র। দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের নিয়ে সাপ্তাহিক, যরূরী, দায়িত্বশীল ও মাসিক কর্মী বৈঠক করতে হবে। ফলে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার প্রসার ঘটবে। উল্লেখ্য যে, নেতৃত্বের প্রতি যথাযথ আনুগত্য এবং কর্মীদের প্রতি স্নেহশীল হতে হবে।

***প্রশ্ন (১৩/৭২) : 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই?***

*- শফিকুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

**উত্তর :** ১৯৬১ সালের ২৮ শে মে গঠিত 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' (Amnesty International)-এর সদর দফর যুক্তরাজ্যে অবস্থিত। পৃথিবীর দেশে দেশে পরিচালিত রাজনৈতিক নির্যাতন, কারারুদ্ধকরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং এরূপ অপরাধ যথাসম্ভব প্রতিরোধ করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বর্তমানে ১৫০ দেশে এর শাখা রয়েছে।০০২০ মানবতা ও শান্তির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৭৭ সালে 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-কে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর বর্তমান মহাসচিবের নাম ভারতের সলিল শেঠি। প্রথম নারী, প্রথম এশীয়, প্রথম বাংলাদেশী ও প্রথম মুসলিম মহাসচিব ছিলেন আইরিন খান। এটি মানবাধিকার সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সারা বিশ্বে কাজ করে যাচ্ছে।

***প্রশ্ন (১৪/৭৩) : আবু যার গিফারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা জানতে চাই।***

*আব্দুল্লাহ আল-মুজাহিদ*
*নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী*

**উত্তর :** আবু জামরাহ (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাদেরকে বললেন, আমি কী তোমাদেরকে আবু যার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অব্যশই। তিনি বলেন, আবু যার (রাঃ) বলেছেন, আমি গিফার গোত্রের একজন মানুষ। আমরা জানতে পারলাম, মক্কায় এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাইকে বললাম, তুমি মক্কায় গিয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে এস। সে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মক্কার ঐ লোকটির সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে ফিলে আসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর নিয়ে এলে? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি একজন মহান ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করেন। আমি বললাম, তোমার খবরে আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারলাম না। অতঃপর আমি একটি ছড়ি ও একপাত্রে কিছু

খাবার নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা দিলাম। মক্কায় পৌঁছিয়ে আমার অবস্থা দাঁড়ালো এমন-তিনি আমার পরিচিত নন। কারো নিকট জিজ্ঞেস করাও আমি সমীচীন মনে করি না। তাই আমি যমযম কূপের পানি পান করে মসজিদে থাকতে লাগলাম। একদিন সন্ধ্যা বেলা আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে গমনকালে আমার প্রতি ইশারা করে বলেন, মনে হয় তুমি বিদেশী। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চল। পথেই তিনি আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আর আমিও ইচ্ছা করে কোন কিছু বলিনি। তাঁর বাড়িতে রাত্রি যাপন করে ভোর বেলায় আবার মসজিদে গেলাম, যাতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু ওখানে এমন কোন লোক ছিল না যে, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তারা কিছু বলবে। ঐ দিনই আবার আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে চলার সময় বললেন, এখনো কি তুমি তোমার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে চল। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বল, তোমার বিষয় কী? কেন এ শহরে এসেছ? আমি বললাম, যদি আপনি আমার বিষয়টা গোপন রাখার আশ্বাস দেন তাহ'লে তা আপনাকে বলতে পারি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তা গোপন করব। আমি বললাম, আমরা জানতে পেরেছি, এখানে এমন লোকের আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফেরত গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কোন কিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে আগমন করেছি।

আলী (রাঃ) বললেন, তুমি সঠিক পথ প্রদর্শক পেয়েছ। আমি এখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হবার জন্য রওয়ানা হয়েছি। তুমি আমাকে অনুসরণ কর এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করি তুমিও সে গৃহে প্রবেশ করবে। রাস্তায় যদি বিপদজনক কোন লোক দেখতে পাই তবে আমি জুতা ঠিক করার অযুহাতে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতা ঠিক করছি। তুমি কিন্ত চলতেই থাকবে। আলী (রাঃ) পথ চলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলে, আমিও তাঁর সঙ্গে ঢুকে পড়লাম। আমি বললাম, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। আর আমি মুসলিম হয়ে গেলাম।

নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আবু যার! এখনকার মত তোমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখে তোমার দেশে চলে যাও। যখন আমাদের বিজয়ের খবর জানতে পারবে তখন এসো। আমি বললাম, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমি কাফির-মুশরিকদের সামনে উচ্চৈঃস্বরে তাওহীদের বাণী ঘোষণা করব। (ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,) এই কথা বলে তিনি মসজিদে হারামে গমন করলেন, কুরাইশের লোকজনও সেখানে হাযির ছিলেন। তিনি বললেন, হে কুরাইশগণ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। তাঁর এ কথা শ্রবণে কুরাইশগণ বলে উঠলো, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। অতঃপর তারা আমার দিকে এগিয়ে আসল এবং আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল; যেন আমি মরে যায়। তখন আব্বাস (রাঃ) আমার নিকট পৌঁছে আমাকে ঘিরে রাখলেন। অতঃপর তিনি কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা গিফার বংশের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছ অথচ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলাকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। একথা শুনে তারা সরে পড়ল। পরদিন ভোরবেলা কা'বাগৃহে উপস্থিত হয়ে গতদিনের মতই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্ব ঘোষণা দিলাম। কুরাইশরা বলে উঠলো, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। গতদিনের মত আজও তারা নির্মমভাবে আমাকে মারধর করল। এই দিনও আব্বাস (রাঃ) এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে ঐ দিনের মত বক্তব্য রাখলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই ছিল আবু যার গিফারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা *(বুখারী হা/৩৫২২, 'আবু যার গিফারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা' অনুচ্ছেদ-১১, অধ্যায়-৬১)*।

***প্রশ্ন (১৫/৭৪) : মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিলের পর মদীনার অলিগলিতে মদের স্রোত বইয়ে গিয়েছিল। এ কথা কি সঠিক।***

*মেহেদী হাসান, মিরপুর, ঢাকা।*

**উত্তর :** উক্ত বক্তব্য সঠিক *(মুসলিম হা/৫২৪৬)*।

***প্রশ্ন : (১৬/৭৫) : বাসরশয্যা থেকে কোন্ ছাহাবী জিহাদের ময়দানে গমন করেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি জানতে চাই?***

*-আতীকুর রহমান*
*গাযীপুর চৌরাস্তা, গাযীপুর*

**উত্তর :** নিবেদিতপ্রাণ ছাহাবী হানযালা (রাঃ), যিনি 'গাসীলুল মালাইকা' নামে পরিচিত। তিনি এমন এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন, ইতিহাসে যা বিরল। ওহোদ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এই সময় তিনি আবার নতুন বিয়ে করেছিলেন। অতঃপর যখন যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছিল, তখন তিনি ছিলেন বাসর শয্যায়। আহ্বান শুনার সাথে সাথে তিনি রওয়ানা হন জিহাদের উদ্দেশ্যে। ঝাঁপিয়ে পড়েন বীরদর্পে জিহাদের ময়দানে। যুদ্ধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর হানযালা (রাঃ) মুশরিকদের ব্যূহ ভেদ করে তীব্র বেগে তাদের সেনাপতি আবু সুফিয়ানের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যান। অতঃপর তাকে লক্ষ্য করে তলোয়ার তোলার সময় শয়তান শাদ্দাদ ইবনু আওস দেখে ফেলে এবং হানযালা (রাঃ)-এর ওপর আকস্মিক হামলা চালায়। এতে তিনি শাহাদত বরণ করেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৩০)*।

***প্রশ্ন ১৭/৭৬) : ওহোদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গেছিল কে এবং তাকে কে হত্যা করেছিল?***

*-আখতারুযযামন*
*বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার, সাতক্ষীরা*

**উত্তর :** ওতবা ইবনু আব্দুল ওয়াক্কাছ নামক কুখ্যাত মুশরিক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গেছিল। ওহোদের যুদ্ধে যখন মুশরিকরা মুসলিমের ওপর অতর্কিত হামলা করে, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে দু'জন ব্যতীত সকলেই শাহাদত বরণ করেছেন। এই সময়টা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের চরম সংকটময় মুহূর্ত। অতঃপর এমনি সময়ে শয়তান ওতবা ইবনু আব্দুল ওয়াক্কাছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। অতঃপর উক্ত আঘাতে তাঁর নীচের মাড়ির ডান দিকের 'রোবায়ী দাঁত' ভেঙ্গে যায়, নীচের ঠোঁট কেটে যায়। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়। এরকম কঠিন মুহূর্তে দুর্বৃত্ত আব্দুল্লাহ ইবনু কুমায়া রাসূলের সামনে এসে তাঁর কাঁধে প্রচণ্ড জোরে তলোয়ারের আঘাত করে, যে আঘাতের যন্ত্রণা তিনি এক মাস পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন। তবে আঘাত তাঁর লৌহবর্ম কাটতে পারেনি। পরেই সেই দুর্বৃত্ত ইবনু কুমায়া তরবারী তুলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দ্বিতীয়বার আঘাত করে। এ আঘাত তাঁর ডান চোখের নীচের হাড়ে লেগে বর্মের দু'টি কড়া চেহারায় বিঁধে যায়। ফলে যন্ত্রণা আরো তীব্রতর হয়। সাথে সাথে দুর্বৃত্ত কুমায়া বলল, এই

নাও, আমি ইবনু কুমায়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলুন। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র রাসূলের দো'আ অনুযায়ী তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৯০)*।

***প্রশ্ন (১৮/৭৭) : আমার নাম কামারুযযামান। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি যে, আমার পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার বাইরে। আমার পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত পার্শ্ববর্তী মাযারে যায়। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে। বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী করে। এমনকি নযর-নেওয়াযও পেশ করে থাকে। আমাকেও সেখানে যেতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু সেই শৈশবকাল থেকেই আমি এটা মোটেও মেনে নিতে পারিনি। পরবর্তীতে বিভিন্ন বই-পত্র পড়াশোনার পর আমার নিকটে আরো স্পষ্ট হ'ল যে, আমার পরিবার যা করে থাকে তা ঠিক নয়। বর্তমানে এই চিরসত্য কথাটা জানার পরেও আমি না পারছি তাদেরকে বিরত রাখতে, আর না পারছি তাদের সম্মুখে হক্কের উপর আমল করতে। এমনি মুহূর্তে আমি সর্বদা আত্মগ্লানিতে ভুগছি। এক্ষণে আমার করণীয় কী?***

*-কামারুযযামান, চট্টগ্রাম*

**উত্তর :** অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আপনি মাযারে যাওয়া ও সেখানে নযর-নেওয়ায পেশ করাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে একজন সচেতন ঈমানদারের অন্তর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য-প্রার্থনা ও নযর-নেওয়ায পেশ করা কখনই গ্রহণ করতে পারে না। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনার অন্তরে শিরকের প্রতি যে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তা-ই আপনাকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে। এক্ষণে, পারিবারিক যে সমস্যাগুলো আপনাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে, সে ব্যাপারে আমাদের কেবলই পরামর্শ, ধৈর্য ধরুন। সাহস এবং হিকমতের সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা করুন। যদি প্রকাশ্যে সমস্যা বোধ করেন, তাহ'লে আপনি নিজে গোপনে সঠিক পদ্ধতিতে ইবাদত করতে পারেন। কৌশল হিসাবে কিছু হাদীছের কিতাব যেমন বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, রিয়াযুছ ছালেহীন ইত্যাদি গ্রন্থ ক্রয় করে বাসায় রাখতে পারেন। আপাতত কোন আলেমের রচিত ইসলামী বই না রেখে উক্ত বইগুলো রাখুন। অতঃপর নিজে পড়ুন এবং পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে পড়ানোর পরিবেশ তৈরী করুন। সর্বদা হাশি-খুশি ও সবার সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখুন। সুন্দর আচরণ দিয়ে তাদেরকে সঠিক দ্বীন বুঝানোর চেষ্টা করুন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। নবীদের জীবনী অধ্যয়ন করুন। তাওহীদ-শিরক ও সুন্নাত-বিদ'আত সম্পর্কে নিজের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করুন। অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করুন এবং পরিবারের সদস্যদেরকে কুরআন পাঠের প্রতি গুরুত্বারোপ করুন। তাদের হেদায়াতের জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করুন। মনে রাখবেন, হেদায়াতের মালিক মহান আল্লাহ। তিনি যাকে খুশী হেদায়াত করতে পারেন। আপনার দায়িত্ব মানুষের কাছে সঠিক দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া।

***প্রশ্ন (১৯/৭৮) : আমি একজন মালয়েশিয়া প্রবাসী। বর্তমানে দেশে অবস্থান করছি। সেখানে থাকাবস্থায় আমি আহলেহাদীছের দাওয়াত পাই ও গ্রহণ করি। কিন্তু দেশে আসার পর আমি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে পারছি না। কেননা আমার পরিবার মাযহাবী। বুকে হাত বাধা, রাফউল ইয়াদায়েন করা, জোরে আমীন বলা ইত্যাদি সম্পর্কে হাদীছের কথা বললে কখনো আমার মারার হুমকি দেয়, কখনো বা গ্রাম থেকে বহিষ্কারের কথা বলে। অন্যদিকে আমার বাড়ীতেও হাদীছ সম্মত ইবাদত করা সম্ভব নয়। অথচ আমিতো মনে-প্রাণে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে ইচ্ছুক। এই মুহূর্তে আমি কী করতে পারি?***

*-মাসঊদ রানা, নোয়াখালী*

**উত্তর :** হক্ব ও বাতিলের লড়াই এটা পৃথিবীর চিরন্তন নিয়ম। সত্যকে গ্রহণ করলে ও তদনুযায়ী আমল করলে বাতিলপন্থীদের কাছ থেকে বাধা আসবে এটাই স্বাভাবিক। আপনি ছহীহ পদ্ধতিতে এলাকার মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে বাধা আসলে বাড়ীতে আদায় করুন। আপনি প্রাথমিকভাবে মসজিদের কিছু তরুণ ও যুবক ভাইকে টার্গেট করে কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার দাওয়াত দিন। ভেঙ্গে পড়বেন না। সর্বদা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। মনে রাখবেন, আমাদের রাসূল (ছাঃ)ও শুরুতে একক ব্যক্তিই ছিলেন। তিনি যে জাহেলী পরিবেশে হক্কের দাওয়াত প্রদান শুরু করেছিল তা বর্তমান সময়ের চেয়ে বহুগুণ ভয়াবহ ও কঠিন ছিল। তারপরেও তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও কৌশলের সাথে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন ও নিজে তার উপর আমল করেছেন। এইজন্য নবীচরিত অধ্যয়ন করুন। দাওয়াত দিয়ে যখন কিছু মানুষ তেরী হবে, তখন প্রকাশ্যে ছহীহ হাদীছের তাবলীগ শুরু করুন। ইসলামের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়েছিল দীর্ঘ ১৩ বছরের রক্তস্নাত ও পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিয়ে। অতএব আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে সামনে অগ্রসর হোন। সাহস হারাবেন না। যাত্রাপথ যত কণ্টকময়ই হোক না কেন, সাফল্য প্রকৃত মুমিনদের জন্যই, যদি ঈমানের উপর টিকে থাকা যায়। এটাই আল্লাহ্‌র ওয়াদা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই বিজিত হবে যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

***প্রশ্ন (২০/৭৯) : দারুন নাদওয়ার বৈঠক কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং উক্ত বৈঠকে কোন্ কোন্ নেতা উপস্থিত ছিল?***

*-জাফর ইকরাম, নরসিংদী*

**উত্তর :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করার জন্য কুরাইশ বাহিনী বিশ্ব ইতিহাসের জঘন্যতম এক সম্মেলনের আয়োজন করে, ইতিহাসে যা 'দারুন নাদওয়া' বৈঠক নামে পরিচিত। উক্ত বৈঠকটি নবুঅতের চতুর্দশ বছরের ২৬শে ছফর মোতাবেক ১২ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃঃ রোজ বৃহস্পতিবারের প্রথম প্রহরে অনুষ্ঠিত হয় *(মানছূরপুরী, রহমাতুল লিল 'আলামীন ১/৯৫, ৯৭, ১০২)*। উক্ত সম্মেলনে কুরাইশের সকল গোত্রের প্রতিনিধি যোগদান করে। আলোচ্য বিষয় ছিল, এমন একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যাতে অতিসত্বর ইসলামী দাওয়াতের কর্মসূচীকে দুনিয়া থেকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। উক্ত জঘন্য সম্মেলনে যে সমস্ত কুখ্যাত গোত্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিল তাদের নাম নিম্নরূপ : (১) মাখযূম গোত্র থেকে আবু জাহল (২) নওফাল ইবনু আব্দে মানাফ গোত্র থেকে যুবায়র ইবনু মুতঈম, তুয়ায়মা ইবনু আদী ও হারেছ ইবনু আমের (৩) আব্দে শামস ইবনু আব্দে মানাফ গোত্র থেকে শায়বা ইবনু রবি'আ, ওতবা ইবনু রবি'আ ও আবু সুফিয়ান ইবনু হারব (৪) আব্দুদ দার গোত্র থেকে নযর ইবনু হারেছ (৫) আসাদ ইবনু আব্দুল ওযযা গোত্র থেকে আবুল বাখতারী ইবনু হিশাম, যাম'আ ইবনু আসওয়াদ ও হাকিম ইবনু হিযাম (৬) ছাহাম গোত্র থেকে নোবা ইবনু হাজ্জাজ ও মুনাব্বাহ ইবনু হাজ্জাজ এবং (৭) জুমাহ গোত্র থেকে উমাইয়া ইবনু খালফ *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১২৫)*। অর্থাৎ ৭টি গোত্র থেকে মোট ১৪ জন কুরাইশ নেতা উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিল।

# কবিতা

## অবাক বিস্ময়

-আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী

সময়ের প্রয়োজনে ইতিহাসে ডুব দিয়ে দেখ হে বাঙালী!
দেখ নিপেক্ষভাবে স্বার্থদ্বন্দ্ব ভুলি
ইসলাম তোমার স্বাধীনতার একমাত্র ভিত্তি ও শিকড়
কিন্তু কেন আজ আইনাঘাত চলে ইসলামের উপর?
হে বাঙালী! তুমি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র, কীভাবে কর দাবী!
অথচ নেই তোমার কোন কর্মকাণ্ডে ইসলামের ছবি!
ইসলাম কী নয় তোমার স্বাধীনতার একমাত্র রবি?
দেখ আজি একবার ভেবে-
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হ'য়ে তুমি মুসলিম রাষ্ট্র হ'লে কিভাবে?
দেখ জাতীয় কবি যদিও মুসলমান,
কিন্তু রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত কেন ইসলামবিরোধী হিন্দু কবির গান?
স্মরণ করে দেখ হে বাঙ্গালী একবার,
অশ্রুতে ভরে আসবে দুনয়ন তোমার!
তুমি হয়েছ প্রগতিবাদী, গ্রহণ করেছ বিদেশী অপসংস্কৃতি
রয়েছে তোমার সংস্কৃতি কিন্তু নেই কেন তাতে কোন প্রীতি?
চেয়ে দেখ আজি-
ইসলামবিরোধী পাশ্চাত্য মতবাদ তোমার জীবন চলার পুঁজি।
তুমি ধর্মনিরপেক্ষতাবদী, তুমি গণতন্ত্রের হকার
ভিনদেশী মতবাদ বাস্তবায়নে তোমারই দরকার।
স্মরণ করে দেখ আজি, হে বাঙালী জাতি!
তুমি কত মূর্খ, তোমার কত রয়েছে পাশ্চাত্য প্রীতি
তুমি মাতৃভাষা দিবস করছ পালন ২১শে ফেব্রুয়ারী
বাংলার জন্য দিয়ে জীবন ইংরেজীতে তা করছ স্মরণ
এরকমই ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৫ আগস্ট ইংরেজীতে করছ বরণ!
তুমি পালন কর 'এপ্রিল ফুল', মুসলিম ইতিহাসের মর্মন্তুদ একবেলা
অথচ তোমার কর্তব্য ছিল চোখ হ'তে পানি ফেলা।
কিন্তু হায়, তুমি মুসলিম ইতিহাস নিয়ে করছ খেলা!
হে বাঙালী! স্বাধীনতার শিকড়ে করেছ আঘাত আজ
স্বাধীনতার ভিত্তি ইসলামে ফেলে বাজ।
অতএব, হুঁশিয়ার হও হে বাঙালী জাতি!
তুমি আল্লাহ ছাড়া করিও না কারো কাছে মাথানতি
চেয়ো না প্রগতির নামে ভিনদেশী অপসংস্কৃতি
ইসলামী বিধান করে কায়েম, থাকো স্বাধীন
বিশ্ব দরবারে ওদের মান হবে বিলীন।

--০--

## আল্লাহ্র মহাত্ম্য

*শফিকুল ইসলাম (শফিক)*
*এম. এ. (শেষ বর্ষ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

সব কিছুরই প্রভু তিনি সৃষ্টিরাজি বেশ,
তাঁরি দয়ায় বেঁচে আছি নাই যে দয়ার শেষ;
সারা জীবন গুনেও কভু গুনছ তারি লেশ।
সব কিছুরই প্রভু তিনি সৃষ্টিরাজি বেশ,
তাঁরি দয়ায় বেঁচে আছি নাই যে দয়ার শেষ;
সারা জীবন করি যেন কৃতজ্ঞতা পেশ।
নদী দেখো কলকল ছন্দে বয়ে যায়,
সাগর দেখো জল তরঙ্গে মুগ্ধ করে হায়!
বৃক্ষ দেখো লতা-পাতা দুলে জুড়ায় প্রাণ,
পাখি দেখো মিষ্টি সুরে গাইছে তারি গান।
সৃষ্টি জগৎ নিয়ে ভাবি আঁখি অনিমেষ।।
আকাশ দেখো চতুর্দিকে লক্ষ তারার ঘের,
চন্দ্র দেখো আলো ছড়ায় হয় না আলোর ফের।
পাহাড় দেখো কতো উঁচু তারি গুণধাম,
ঝরণা দেখো কেমন করে ঝরছে অবিরাম।
পালন করি সবাই সদা নিষেধ-উপদেশ।।

--০--

## জাগো

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব
নওদাপাড়া, মাদরাসা

জাগো, জাগো হে যুবক!
প্রহর তোমারি গুনছে ভূলোক।
মহী মাঝে চেয়ে দেখ একবার,
অশুভ শক্তি ছেয়ে ফেলেছে প্রভাকর।
কর্ণকুহরে কেবলই করুণ সুর,
দিচ্ছে নাড়া থেকে দূর-অদূর।
ধরাধাম হয়েছে লাশের গন্ধে ভারী,
আজি যায় শোনা প্রাণের আহাজারি।
কেন মুক্ত মানবের ঠিকানা বন্দীশালা,
বিসর্জন দিবে আর কত অশ্রুমালা।
কেন ঘটে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড,
মানুষ কী হতে পারে এতটাই পাষণ্ড!
কেন হয় প্রবাহিত তোমার শোনিত ধারা,
হবে আর কত জননী সন্তানহারা!
কে বধ করল তোমার উচ্চশীর,
দেখবো আর কত পিতার নেত্রনীর!
লোচনাশ্রু করা যায় না সংবরণ,
রুধির দেয় যবে নাড়ি ছেড়া ধন।
জনতা পেট্রোলবোমার অসহায় খোরাক (!)
তাকিয়ে দেখছে জাতি হয়ে নির্বাক।
সোনার বাংলা আজ খুনের সাতকাহন,
পুড়ছে মানুষও, নয় শুধু বাহন।
চাই তোমার কাছে একজন ওমর,
যে করবে ফাঁস অন্যায়ের গোমর।
চাই বিন কাসিমের মত তোমার আবির্ভাব,
দাও ভেঙ্গে অন্যায়ের ঐ লৌহকবাট।
রেখোনা চেপে তোমার ধূমায়িত ক্ষোভ,
করে দাও বিস্ফোরণ, থেকোনা নিষ্প্রভ।
শতবার নিপাত যাক, ঐ নোংরা গণতন্ত্র,
ইসলাম হোক উদ্ভাসিত নিয়ে বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র।
উৎসর্গ হোক জাতির তরে তোমার শৌর্য-বীর্য,
তবেই না উদিত হবে ভোরের সোনালী সূর্য।

--০--

# সংগঠন সংবাদ

### কেন্দ্রীয় সংবাদ

**গরাতকান্দি, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ১০ জুন বুধবার :** অদ্য বাদ আছর গরাতকান্দি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মসজিদের ইমাম আব্দুল মুত্তালিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এনামুল হক্ব সবুজ, সাধারণ সম্পাদক তুহিন ও জালালুদ্দীন প্রমুখ।

**যশোর ১১ জুন বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ যোহর যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, কেশবপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুত্তালিব বিন ইমাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তরীকুল ইসলাম ও যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

**কাঁকডাঙ্গা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১২ জুন শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর কাকডাঙ্গা সিনিয়র ফাযিল মাদরাসায় এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পদাক হাফেয হাসীবুল ইসলাম, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুকাররম বিন মুহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া ও যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল বৃন্দ।

**বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৭ জুন বুধবার :** অদ্য সকাল ৯ ঘটিকায় বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারের অডিটরিয়ামে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক 'ছাত্র সংবর্ধনা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলনাা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ বিন মুসলিম, সাধারণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস, অর্থ সম্পাদক দেলোওয়ার হোসাইন, প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান প্রমুখ। উক্ত ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শতাধিক ছাত্র উপস্থিত হয়। তাদের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'সমাজ বিপ্লবের ধারা', 'তালাক্ব ও তাহলীল' এবং 'তিনটি মতবাদ' বই উপহার দেওয়া হয়।

### মাসব্যাপী রামাযানের সফর

**কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ২৯ জুন সোমবার :** অদ্য বাদ আছর কেশরহাট কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কেশরহাট এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ কামাল কেশরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী (পশ্চিম) 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক দুরুল হুদা, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আবু তাহের সহ প্রমুখ।

**নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া পূর্ব ২৯ জুন সোমবার :** অদ্য বাদ যোহর নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবির ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাশিমুদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সহ-সভাপতি হাফেয মুহসিন, জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম সহ প্রমুখ।

**জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা ৩০ জুন মঙ্গলবার :** অদ্য বাদ যোহর জয়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবির ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম প্রমুখ।

**বুড়িচং, কুমিল্লা ৩০ জুন মঙ্গলবার :** অদ্য বিকাল ৪ ঘটিকায় বুড়িচং উত্তর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জাফর ইকরাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধী মণ্ডলী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'যুবসংঘ'-এর অনুমোদিত কর্মী মুহাম্মাদ কাশিদুল ইসলাম।

**চাঁদপুর ১ জুলাই বুধবার :** অদ্য দুপুর ১.৩০ মিনিটে চাঁদপুর প্রেসক্লাব ভবনে এলিট চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি সেন্টারে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন চাঁদপুর'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। চাঁদপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও চাঁদপুর হাদীছ ফাউণ্ডেশন-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ্‌র সভাপতিত্তে উক্ত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও সোনামণি'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, সঊদী মুবাল্লিগ আ.ন.ম নূরুর রহমান মাদানী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বখরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ওয়াক্কাছ আলী, সহ-সভাপতি মাহাদী হাসান ও ইমরান হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ রাসেল, আল-আমীন স্কুল এ্যাণ্ড কলেজের মিক্ষক মুহাম্মাদ তুফাজ্জল হোসেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়াত হোসেন।

**চাঁদমারী, পাবনা ২ জুলাই বৃহস্পতিবার :** অদ্য যোহর চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবির ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তারেক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার সহ প্রমুখ।

**সত্যজিৎপুর, রাজবাড়ী ৩ জুলাই শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ সত্যজিৎপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবির ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাক্বূল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন সহ প্রমুখ।

**চণ্ডিপুর, মনিরামপুর, যশোর ৩ জুলাই শুক্রবার :** অদ্য বাদ যোহর চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তরীকুল ইসলাম, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক আশরাফুল ইসলাম ও কেশবপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুত্তালিব বিন ইমাম প্রমুখ।

**সাহারবাটি, মেহেরপুর ৪ জুলাই শনিবার :** অদ্য বাদ যোহর সাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবির ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, মেহেরপুর পৌর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক মাহমূদুল্লাহ সহ প্রমুখ।

**পূর্বাচল, নারায়ণগঞ্জ ৫ জুলাই রবিবার :** অদ্য বাদ যোহর পূর্বাচল উপশহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পূর্বাচল উপশহর 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক 'আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দপুর দাখিল মাদরাসার সভাপতি মারফত আলী। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সসদ্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি কেরামত আলী ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি সোহেল আহমাদ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ছালাহুদ্দীন মেম্বর। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন 'আন্দোলন'-এর পূর্বাচল উপযেলার সহ-সভাপতি আব্দুল হাইয়ুল।

**ধর্মদহ, কুষ্টিয়া পশ্চিম ৫ জুলাই রবিবার :** অদ্য বাদ যোহর ধর্মদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবির ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন সহ প্রমুখ।

**সাড়ে সাতরশি (আটরশি মাযারের পার্শ্বে), ফরীদপুর ৭ জুলাই মঙ্গলবার :** অদ্য বাদ আছর সদরপুর উপযেলাধীন সাড়ে সাতরশি সৈয়দ মঞ্জিল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক 'আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ'-এর আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগের ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদরপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুছ ছামাদ সহ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, আটরশি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে এক স্থানে বাদ এশায় এক অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন মুযাফফর বিন মুহসিন।

**ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ৭ জুলাই মঙ্গলবার :** অদ্য বাদ যোহর ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও

'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবির ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার সহ প্রমুখ।

**বিরল, দিনাজপুর ১০ জুলাই শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বিরল উপযেলা 'আন্দোলন' কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হাফেয হাসিবুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম ও রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

**নাছিরাবাদ, ঢাকা ১০ জুলাই শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর নাছিরাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব সহ প্রমুখ।

**কাঁচিয়ার চর, সলাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ ১১ জুলাই শনিবার :** অদ্য বাদ যোহর কাঁচিয়ার চর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কাঁচিয়ার চর শাখা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযা, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্য উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধী মণ্ডলী।

**খানসামা, দিনাজপুর ২৫ জুলাই রবিবার :** অদ্য বাদ আছর খানসামা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। খানসামা উপযেলা সভাপতি মহসিন ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

**হরিহরনগর, মনিরামপুর, যশোর ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব হরিহরনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর অত্র শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। আরও আলোচনা পেশ করেন অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা কামাল হোসেন। ইজতেমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মনিরামপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী আবুল হাসান ছাহেব।

**যশোর টাউন ১৪ আগষ্ট, শুক্রবার :** অদ্য সকাল ১১ টায় যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন'-এর সদর উপযেলার উদ্যোগে এক 'দায়িত্বশীল ও সুধী সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন এবং জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আলহাজ আব্দুল আযীয, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা তরীকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি হাফেয তরীকুল ইসলাম প্রমুখ। অত্র অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন হুমায়ুন কবীর।

**লক্ষণপুর, শার্শা, যশোর ১৪ আগষ্ট শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর লক্ষণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' লক্ষণপুর এলাকার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ বদীউযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন। যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক প্রচার সম্পাদক ইকরামুল ইসলাম প্রমুখ।

## সোনামণি ও অভিভাবক সম্মেলন

**কোমরগ্রাম, জয়পুরহাট ২৬ জুন শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ কোমরগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'সোনামণি' কর্তৃক আয়োজিত এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক মুহাম্মাদ মুনায়েম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক ও আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান শফিকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও সোনামণি'-এর উপদেষ্টা আবুল কালাম, সাবেক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও সোনামণি'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম প্রমুখ।

**মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর ১৪ আগষ্ট, শুক্রবার :** অদ্য সকাল ৭ ঘটিকায় মজিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি'-এর যেলা পরিচালক আশরাফুল আলমের সভাপতিত্বে এক 'সোনামনি ও অভিভাবক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'-এর সাবেক পৃষ্ঠপোষক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলনে'র প্রচার সম্পাদক আব্দুস সালাম ও যেলা 'যুবসংঘে'র অর্থ সম্পাদক হাফেয আনোয়ার জাহিদ, কেশবপুর উপযেলা 'আন্দোলনে'র সহ-সভাপতি মুত্তালিব বিন ঈমান প্রমুখ। উল্লেখ্য সম্মেলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসংখ্য সোনামণি, ছাত্র, যুবক, মুরুব্বী ও মহিলারা অংশগ্রহণ করেন।

# আইকিউ

*[কুইজ-১; কুইজ-২; বর্ণের খেলা-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ১৫ অক্টোবরের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]*

**কুইজ ১/৮ (১) :**

১. ইয়ামান কোন্ প্রণালীর মুখে অবস্থিত?
২. হুছী কারা?
৩. হুছীদের দলের নাম কি?
৪. মানুষকে হিংস্র পশুতে পরিণত করে কোন্ জিনিস?
৫. শয়তান মানুষকে কি করে?
৬. 'দ্বীনের ব্যাপারে অনুমান করিয়া অথবা অভিমত খাটাইয়া কথা বলা সিদ্ধ নয়' এটি কার বক্তব্য?
৭. 'উমদাতুল হাদীছ' গ্রন্থের লেখক কে?
৮. 'হাদীছে খামসীন' গ্রন্থের লেখক কে?
৯. পৃথিবীতে বর্তমানে কতটি পারমানবিক বোমা রয়েছে?
১০. হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার নাম কি?
১১ নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার নাম কি?
১২. 'লিটল বয়' ও 'ফ্যাটম্যান'-এর দৈর্ঘ্য কত ফুট?
১৩. কত বছর পর ছিট মহল সমস্যার নিরসণ হল?
১৪. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল কতটি?
১৫. ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল কতটি?

**গত সংখ্যার কুইজের উত্তর :** ১. প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া ২. ২০ বছর ৩. ইহুদী, খ্রীষ্টান ও কাফেররা ৪. পাকস্থলী ৫. Immigrant ৬. শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ আলে শায়খ ৭. অস্ট্রেলিয়া ৮. ২০১৪ ৯. ১৩৯ ও ২৮ ১০. চৈত্র মাস ১১. আকবারের সময় থেকে ১২. শুক্রবার ১৩. মাওলানা বেলায়াত আলী ১৪. ১৯১৩ সালে ১৫. ১৯৩৬ সালে বৃটিশ সরকার লর্ড মেকলের মাধ্যমে।

**কুইজ ২/৮ (২) :**

১. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম স্ত্রীর নাম কী?
২. খাদিজা (রাঃ)-এর পূর্বের স্বামীর নাম কি ছিল?
৩. খাদিজা (রাঃ) কোন্ ধরনের মহিলা ছিলেন?
৪. খাদিজা (রাঃ)-এর মাতার নাম কি?
৫. খাদিজা (রাঃ)-এর পিতার নাম কি?
৬. খাদিজা (রাঃ) কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
৭. রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাদিজার বিয়ের মোহরানা কত ছিল?
৮. খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে বিয়ের সময় রাসূল (ছাঃ) ও তার বয়স কত ছিল?
৯. খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে বিয়ের কত বছর পর নবী (ছাঃ) নবুঅত পান?
১০. পৃথিবীতে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহিলার নাম কি?

**গত সংখ্যার কুইজের উত্তর :** ১. আল্লাহ্র এক অলৌকিক নিদর্শন। ২. প্রায় ৫ হাযার বছর। ৩. সর্বপ্রাচীন জীবন্ত কূপ ৪. ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্ত্রী-পুত্রকে মক্কার নির্জন ভূমিতে রেখে যাওয়ার ঘটনা। ৫. আল্লাহ্র নির্দেশে জিবরীল (আঃ)-এর পায়ের আঘাতে। ৬. নিয়ন্ত্রণ করা বা লাগাম ধরা। ৭. এর কোন রং বা গন্ধ নেই। তবে বিশেষ এক প্রকার স্বাধ রয়েছে, যা অন্য পানি থেকে ভিন্ন। ৮. সাড়ে তিন হাতের চেয়ে একটু কম। ৯. প্রায় ৭৫ কিলোমিটার। ১০. ২১ মিটার (৬৬ ফুট) পূর্বদিকে।

**শব্দজট ৩/৮ (১) :**

**উপর-নীচ :** ১. একটি ফুলের নাম ২. দয়ার আরবী শব্দ ৪. পেঁয়াজের ন্যায় আকৃতি ৫. আল্লাহ্র গুণবাচক নাম ৭. ইসলামের একটি স্তম্ভ ৯. আরবের একটি শহর ১১. সুস্বাদু ফলের নাম।

**পাশাপাশি :** ১. ইসলামের একটি যুদ্ধের নাম ৩. পাখির আরবী শব্দ ৫. একটি আরবী মাসের নাম ৬. বাংলাদেশের নতুন ঝর্ণা ৮. কুরআনের একটি সূরার নাম ১০. একটি যেলার নাম ১১. আহ্বান শব্দের আরবী শব্দ।

**গত সংখ্যার বর্ণের খেলার সঠিক উত্তর :** ১.ইখলাছ ২.মুসলিম ৩.কিলাদাহ ৪.তায়াম্মুম। অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম : **ইসলাম**

**সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৭:**

**নির্দেশনা :**

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

**গত সংখ্যার কুইজের উত্তর :**

(ক) ১০+৫-৮+১=৮ (খ) ৩×৫+২-৭=১০ (গ) ৬÷২×৪-৩=৯

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা :** বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*